বুদ্ধদেব বসু

শেষ পাণ্ডুলিপি



এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
কলকাতা-১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলকাতা-১২

রচনাকাল : ১৯৫৫-৫৬

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬৩ : অক্টোবর ১৯৫৬

তিন টাকা চার আনা

প্রচ্ছদ : শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক : শ্রী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

১৯৫৫ বড়োদিন-সংখ্যা 'উল্টো রথে'
'শেষ পাণ্ডুলিপি' প্রথম প্রকাশিত
হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

বু. ব.

উৎসর্গ

শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

বীরেশ্বর গুপ্তর এই শেষ পাণ্ডুলিপিটা মাসখানেক আগে আমার হাতে এসেছিলো। হাসপাতালের কর্তারা তার অন্যান্য জিনিশের সঙ্গে এটাও তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে আমি পেয়েছি। সঙ্গে আরম্ভ-করা, শেষ-না-করা আরো কিছু লেখার কাগজ-পত্র। টেবিলের দেরাজ থেকে, তোশকের তলা থেকে, বইয়ের পাতার ভাঁজ থেকে, কান-ভাঙা, দোমড়ানো, এলোমেলো ঐ কাগজ-গুলো আমাকেই খুঁজে বের করতে হ'লো ; কেননা সুধা একে শোকে-দুঃখে জর্জর, তার উপর স্বামীর সাহিত্যিক বা আন্তরিক জীবনের সঙ্গে কোনোকালেই তার যোগ ছিলো না। সেগুলোকে গুছিয়ে, মিলিয়ে, তার প্রত্যেকটি অক্ষর এই এক মাস ভ'রে খুঁটে-খুঁটে মন দিয়ে পড়েছি। খুব খারাপ লাগছে এ-কথা বলতে যে একটি লেখাও এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি, যাতে অসমাপ্ত রচনা ব'লেও প্রকাশ করা যেতে পারে। বীরেশ্বরের মতো প্রচণ্ড লেখক যে এতগুলো লেখা আরম্ভ ক'রে প্রত্যেকটাকে ছেড়ে দিয়েছে, এতেই বোঝা যায় ইদানীং সে কত কষ্ট পাচ্ছিলো, কী-রকম ছিন্নভিন্ন আর বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছিলো তার মন।

একমাত্র ব্যতিক্রম হাসপাতালে লেখা এই রচনাটা। এটাও অবশ্য ঠিকমতো সমাপ্ত নয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে 'রচনা'ও এটাকে বলা যায় না। কোনো পাঠকের জন্য সে এটা লেখেনি ; লিখেছিলো, তার নিজের মতে, হাসপাতালের ক্লান্তিকর সন্ধ্যাগুলো কাটাতে। কিন্তু অন্য

দু-একটা কারণও হয়তো ছিলো। নিশ্চয়ই হাসপাতালের আরাম আর নিয়মের ফলে তার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছিলো; আর ঐ নির্জনতায় ব'সে পেয়েছিলো ভাবার অবকাশ, ফিরে পেয়েছিলো মনোযোগের ক্ষমতা। হয়তো তার সহজাত 'লেখার হাত'—যাঁর প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা প্রকাশ না-ক'রে সে কথা বলতো না—সেইটেকে আর-একবার চালাবার জন্য তার ইচ্ছে হয়েছিলো। হয়তো চেয়েছিলো তার নিজের জীবনের কথা বলতে।

কোনো সাহিত্যিকের আত্মকথার মধ্যে কতখানি সত্য থাকে তা নির্ধারণ করা খুব শক্ত কাজ। একে তো আমাদের স্মৃতি জিনিশটা কল্পনারই সহকর্মী, তার উপর কোনো সাহিত্যিক যখন লিখতে বসে, তাব হাতে জীবন প্রায় অসংবরণীয়ভাবে 'আর্টে' রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে। অনেক তথ্য গোপন থাকে, কিছু রচনা এড়ানো যায় না। অর্থাৎ, যা ঠিক ঘটেছিলো তা নয়—যা ঘটলে মানিয়ে যায়, কিংবা যা ঘটুক ব'লে তার ইচ্ছে ছিলো, বক্তার ঝোঁক থাকে অনবরত সেইদিকেই। নিজের যে-মূর্তিটি সে ভাবতে ভালোবাসে সেটাকেই সে জগতের জন্য রেখে যেতে চায়; যা করতে পারলে সে সুখী হ'তো অথচ বাস্তবে যা পেরে ওঠেনি, সে-রকম কিছু খাদ মিশিয়ে নিজেকে এবং রচনাটাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। এর ক্লাসিক উদাহরণ অবশ্য রুসো; নিজের যে-সব দুষ্কর্ম তিনি বর্ণনা করেছেন তার সবগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়; অনাথ-আশ্রমের কাউণ্টরের উপর নিজের অবৈধ সন্তানকে ফেলে আসার কথাটায় অনেকেই ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য বীরেশ্বরের এই লেখাটার বিষয়ে সে-রকম কোনো সন্দেহ জাগে না, এবং তা একাধিক কারণে। প্রথমত, সে কারো চোখের জন্য লেখেনি এটা, এ-বিষয়ে এত সতর্ক ছিলো যে রাত্রে ছাড়া লিখতো না—

ডাক্তার, নার্স কেউ তার হাতে কলম গ্যাখেনি—লিখে-লিখে কাগজগুলোকে লুকিয়ে রেখেছে বিছানার স্প্রিং-এর গদির তলায়। (মানসিক চিকিৎসালয়ের রুটিন-কাজের মধ্যে একটা হ'লো রোগীরা যা-কিছু লেখে তা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা, ফাইল তৈরি করা, রোগ-নির্ণয়ের দলিল হিশেবে সাজিয়ে রাখা। আমি বেশ বুঝতে পারি যে বীরেশ্বর গুপ্ত, মনোবিকলনের বিজ্ঞান বিষয়ে যার আতঙ্ক ছিলো, লেখার এই ডাক্তারি ব্যবহার ঠেকাবার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি।) দ্বিতীয় কারণ: এই লেখাটার প্রত্যেকটি ঘটনা, এবং ভাবনা আর ধারণাগুলো, সবই একেবারে নতুন—মানে, তার পক্ষে নতুন। সাধারণত লেখকরা তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী সাহিত্য-রচনাতেই ব্যবহার ক'রে ফেলেন—জগতের অনেক উপন্যাসই ছদ্মবেশী আত্মজীবনী—কিন্তু এই পাতাগুলোতে যা আছে বীরেশ্বরের কোনো গল্পে উপন্যাসে তার আভাসমাত্র প্রবেশ করেনি। এই কথাটা ভাবতে আমার খুব অবাক লাগছে, নিজের জীবনটাকে সে যে এমন নির্দয় হাতে তার সাহিত্য থেকে দূরে রাখতে পেরেছিলো। আজ তাই আরো বেশি অবাক হচ্ছি তার নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির কথা ভেবে; যে-'সাধারণ' মানুষের প্রতি অবজ্ঞা আর ঘৃণা ফুটে উঠেছে তার এই লেখাটায়, সেই মানুষকেই সে ভাস্বর ক'রে গেছে তার সাহিত্যে—তার লেখার পাত্র-পাত্রী কখনো কোনো বিষয়ে ভাবে না, শুধু চলে, বলে, কাজ করে, বেঁচে থাকে। আর এটাই আর-একটা কারণ—যেহেতু এই শেষ লেখাটার মধ্যে নানা বিষয়ে এত রকমের চিন্তা সে ছিটিয়ে দিয়েছে—যার জন্যে এটাকে আমি খাঁটি ব'লে বিশ্বাস করতে চাই।

আমি তিরিশ বছর ধ'রে পত্রিকার সম্পাদকি করছি, দেশ-বিদেশের বহু বই আমাকে পড়তে হয়েছে; যতটা আমার বিচারের ক্ষমতা তা-ই

প্রয়োগ করার পর আমার প্রত্যয় হ'লো যে এটা বানানো লেখা নয়, সত্যই বীরেশ্বরের নিজের কথা, জীবনের কথা। অনেক লিখেও নিজের বিষয়ে সে মৌন ছিলো, আমি বলবো চেষ্টা ক'রেই মৌন ছিলো—তাই সে-বিষয়ে একদিন তাকে বলতেই হ'লো। বলতে হ'লো তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা, তার জীবনদর্শন বা দর্শনের অভাব, সমকালীন জগতের বিষয়ে তার মনোভাব—যে-সব প্রসঙ্গ তার প্রকাশ্য লেখা থেকে সযত্নে সে দূরে রেখেছে বরাবর। বলতে হ'লো তার বাবা, মা, স্ত্রী আর প্রণয়িণীদের কথা—যাদের সংঘাতে তার জীবনের কাদায় গহ্বর আর পাহাড় জেগে উঠেছে। এর প্রায় প্রত্যেকটা ঘটনাই আমার সত্য ব'লে মনে হয়। শুধু একটা জায়গায় ঈষৎ সন্দেহ জাগে : গৌরীর সঙ্গে যে-রাত্রিবাসের কথা সে লিখেছে, সত্যি কি তা-ই ঘটেছিলো, না কি শেষ মুহূর্তে পালিয়ে গিয়েছিলো সে? তখন তার যে-বয়স, সেই বয়সেই—বা কিছু আগে—আমি তাকে প্রথম দেখেছিলাম; তার পর তাকে যতটা দেখেছি, যে-রকমভাবে দেখেছি—তাতে তার পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক মনে হয় আমার। মনে হয়, ওটা পারেনি ব'লে তার মনস্তাপ ছিলো; তারই পরিপূরণ করেছে লেখার মধ্যে। নয়তো, ঐ জয়ের পরেও, 'বাবার কাছে হেরে যাওয়া'র বা 'বাবাকে ক্ষমা করা'র কথা কেন?

তারপর ঐ মোটর-দুর্ঘটনার ব্যাপারেও, আমার মনে হয়, সে ইচ্ছে ক'রেই একটু অস্পষ্টতা রেখেছে। তার লেখা প'ড়ে মনে হয় যে দুর্ঘটনাটা সে-ই ঘটিয়েছিলো—প্রায় ইচ্ছে ক'রে, চেষ্টা ক'রে—নেশার ঝোঁকে নয়, তার স্বভাব-অনুযায়ী কোনো চরম পরিণামের দিকে ব্যাপারটাকে ঠেলে দেবার জন্য। ধ্বংসের জন্য নিজেকে দায়ী ক'রে কিছুটা তৃপ্তিও সে পেয়েছে : কিন্তু মোটর-গাড়ি ঠিক কেমন ক'রে আর

কী কারণে উল্টেছিলো তা কেউ জানবে না কোনোদিন। ওটার পিছনে প্রফুল্ল রায়ের কোনো অভিসন্ধি ছিলো তাও আমার পক্ষে কল্পনা করা শক্ত; ওটাকে নিছক দৈব ঘটনা ব'লে ধ'রে নেয়াই আমি সংগত মনে করি।

যা-ই হোক, অনেক ভেবে-চিন্তে এই পাণ্ডুলিপি আমি প্রকাশ করাই স্থির করলাম। জানি, প্রকাশ করার মস্ত বাধা তার স্ত্রী, কিন্তু ও-রকম স্বামীর হাতে প'ড়ে জীবনে সে যত কষ্ট পেয়েছে, এই লেখাটায় তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাবে না। আব তাছাড়া, এটাকে উপন্যাস ব'লেই ছাপছি, পাঠকবা যার যেমন খুশি অর্থ ক'বে নেবেন। অন্তত, এই লেখাটার মধ্যে বহুকাল পর বীরেশ্বর গুপ্তর যৌবনের সাবলীলতা দেখা দিয়েছে—সেই অবসাদহীন বেগ—সেই কারণেও এটা মূল্যবান। বোঝাই যায় খুব তাড়াতাড়িতে লিখেছিলো, উত্তেজনায় লিখেছিলো—পাছে কেউ দেখে ফেলে সেই ভয় সর্বদাই ছিলো বোধহয় মনের মধ্যে। তার ছোটো-ছোটো হাতের অক্ষর কোথাও-কোথাও ত্রস্ততার ফলে কেঁপে উঠেছে, লাইন বেঁকে গেছে, কথা প'ড়ে গেছে, বানানে ভুল হয়েছে মাঝে-মাঝে। এই ত্রুটিগুলো আমি সংশোধন ক'রে দিচ্ছি; বীরেশ্বর গুপ্ত ছাড়া অন্য সব পাত্র-পাত্রীর নামও বদলে দিতে হ'লো। আমি বিশ্বাস করি না লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কলঙ্কের ভয়ে লুকিয়ে রাখাই আমাদের কর্তব্য—কেননা মানুষটার আয়ু আর কতদিন, শেষ পর্যন্ত তার কাজটাই শুধু থাকে। জীবনের কথা জানবার পর কাজটাকে আমরা আরো ভালো বুঝতে পারি তা নয়; কিন্তু এ-সব তথ্যের সাহায্যে শিল্পীর মনের গোপন প্রক্রিয়া জানতে পারি, তাতে সন্দেহ নেই। এ-বিষয়ে আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পক্ষপাতী।

বীরেশ্বরের মৃত্যুর বিবরণ সকলেই জেনে গিয়েছে এতদিনে। আমি সেই পুকুরটা দেখেছি—হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছি মাঝে-মাঝে—এই লেখাটাতেও তার উল্লেখ পাওয়া যাবে। আসলে একটা মজা দিঘি, ঝোপেঝাড়ে শ্যাওলায় দম-বন্ধ হ'য়ে পচা, পুরোনো পাড়াগেঁয়ে ডোবার মতো দেখতে হয়েছে (সেটাকে বুজিয়ে দেবার কথা চলছিলো হাসপাতালের সূত্রপাত থেকেই, এইবার কর্তারা উঠে-প'ড়ে লেগেছেন)—কিন্তু বন্দী অবস্থায় দূরে ব'সে দেখে-দেখে বীরেশ্বরের মনে সেটাই হ'য়ে উঠেছিলো তার গ্রামের টলটলে সচ্ছল দিঘি, যেখানে বাঁশঝাড়ে শুয়ে-শুয়ে সাপের স্বপ্ন দেখতো সে, যে-সাপ একদিন নারীর মূর্তি নিয়ে সত্যিই জড়িয়েছিলো তাকে। দিনের বেলা ঐ সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই পুরোনো কথা সব মনে প'ড়ে গেছে তার ; ঐ ছেলেবেলা, স্বাস্থ্য, যৌবন, আর হয়তো গৌরীর ঠাণ্ডা বুকের আলিঙ্গন—ও-সব ফিরে পাবার তাগিদেই, যা ছিলো শুধু অস্পষ্ট পরিকল্পনা, তা-ই একটা সংকল্প হ'য়ে উঠলো তার মনের মধ্যে। হাসপাতালে মাত্র মাস দেড়েকের মধ্যেই সে যখন অনেকটা 'সেরে উঠলো', তার একটি অনুরোধ মঞ্জুর করলেন ডাক্তাররা : তাকে বাইরে বেরোতে দিলেন, এমনকি ঐ পুকুর-পাড়ের ভাঙা ঘাটলাতে এসে বসতে দিলেন মাঝে-মাঝে। 'এটার জন্যে বার-বার ক'রে বলছিলেন তিনি'—ডাক্তাররা পরে বলেছিলেন আমাকে—'প্রায় মিনতি করেছিলেন। আমরা ভেবেছি এতে ওঁর ভালোই হবে—আর লক্ষণ দেখে তা-ই মনে হচ্ছিলো—কতদিন ফিরে এসে স্বাভাবিকভাবে গল্প করেছেন আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে অবশ্য লোকজন দিয়েছি আমরা—সেদিনও তারা কাছেই ছিলো, কিন্তু মাত্র দু-এক মিনিটের মধ্যে কী হ'য়ে গেলো। আর ঐ পচা ডোবাটায় এত জল ছিলো কে জানতো। আমরা ওঁকে সামনের

মাসে রিলীজ করার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলুম—বাইরের কোনো লক্ষণেই বোঝা যায়নি যে আবার একটা নার্ভাস অ্যাটাক হচ্ছে ওঁর।'

এই হ'লো ডাক্তারদের কথা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে স্নায়ুভঙ্গের জন্যই পুকুরে ডুবেছিলো সে; না—আমার মনে হয়—আর এই লেখাটাতেও সে তা-ই বলেছে—সে বেশ ভেবে-চিন্তেই কাজটি করেছিলো, অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলো ব'লেই করতে পেরেছিলো। ভাবছিলো অনেকদিন ধ'রেই; ভাঙাচোরা শরীর-মন নিয়ে সাহস পায়নি, যেই একটু শরীর ভালো হ'লো সে আর দেরি করলো না। ধুতি ছিঁড়ে পা দুটোকে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়েছিলো, জামার পকেটে ভরা ছিলো বড়ো-বড়ো কাঁকর আর ইটের টুকরো। ঝপ ক'রে আওয়াজ হ'তেই লোকজন ছুটে এলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে, কিন্তু ঐ পাতা-পচা সবুজ জলের মধ্যে অত বড়ো মানুষটা যেন মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেলো। নৌকো বেয়ে, জাল ফেলে, টর্চ জ্বেলে, অনেক রাত অবধি খোঁজাখুঁজি ক'রে (ঘটনাটা ঘটেছিলো বিকেলে)—প্রায় আট ঘণ্টা পরে উদ্ধার হ'লো তার দেহ। পরে পাশের গ্রামের বুড়োরা বললে যে বহুকালের একটা বদনাম আছে পুকুরটার।

সে আর বাঁচতে চায়নি, বাঁচার কোনো অর্থ আর খুঁজে পায়নি: এ-ই সব কথা।

এই লেখাটায় বীরেশ্বর তার নিজের কথা অনেকটাই বলেছে; সেই সঙ্গে, আমার এই অতি প্রিয় লেখক-বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে, আমি দু-একটি কথা যোগ করতে চাই। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক মানুষ আমি দেখেছি, বহু সাহিত্যিক, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিন্তু আর-কেউ আমার মনে তেমনভাবে নাড়া দেয়নি, যেমন দিয়েছে বীরেশ্বর। বয়সে আমার অনেক ছোটো সে, তবু আমি তাকে স্নেহ

যতটা করেছি (এমন একটা জোরালো অথচ আত্ম-অচেতন ভাব ছিলো তার যে তাকে ঠিক স্নেহ করা যেন যেতোই না), তার চেয়েও শ্রদ্ধা করেছি বেশি। সে আমাকে মুগ্ধ করেছে, নিরাশ করেছে, রাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে-মাঝে আমার ঘৃণারও উদ্রেক করেছে—কিন্তু তার খুব 'খারাপ ব্যবহারে'ও তাকে আমার মন থেকে আমি সরিয়ে দিতে পারিনি। পারিনি, তার কারণ তার স্বভাবের ঋজুতা—ইংরেজিতে যাকে বলে অনেস্টি—নানা রকম উগ্র দোষ নিয়েও প্রায় ভয়-পাওয়ানো গোছের ঋজুতা তার। তীরের মতো বেপরোয়া, সোজা মানুষ—নিজের বা অন্যের মুখ চেয়ে কখনো কিছু বলেনি বা করেনি, অবস্থার সঙ্গে মানাবার জন্য একফোঁটা ভেজাল করেনি নিজেকে, তার প্রত্যেকটি কথা আর ব্যবহার সোজাসুজি তার হৃদয় থেকে উঠে আসছে—এবং হৃদয়ের কথা সব সময় খুলে বললে কোন সভ্য সমাজ তা শেষ পর্যন্ত সহ্য করবে? যদি তার জীবনের অবস্থা অন্য রকমও হ'তো, তবু, এই স্বভাব নিয়ে, ধ্বংস না-হ'য়ে তার উপায় ছিলো না।

তার লেখক-জীবনের আরম্ভ থেকেই তাকে দেখছি; আমার 'মাসিক মালঞ্চে'ই প্রথম তার গল্প বেরোয়। মনে আছে যেদিন সে প্রতিযোগিতায় গল্প দিতে এসেছিলো, তার বলিষ্ঠ লম্বা চেহারা আর লাজুক অথচ নির্ভীক আর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে আমি মনে-মনে বলেছিলুম, 'হে ঈশ্বর, এই ছেলেটির লেখাটা যেন ভালো হয়!' সেবার তাকে প্রথম পুরস্কার দিতে পারিনি, কিন্তু ঐ নড়বড়ে লেখাটা যে রাজহাঁসেরই বাচ্চা তাও বুঝেছিলাম। তারপর এতদিন ধ'রে অনেক অবস্থার মধ্যে দেখেছি তাকে। তাকে জড়িয়ে ধরেছি এক-একটা লেখার পাণ্ডুলিপি প'ড়ে, তাকে দেখেছি (যদিও সময়ে-অসময়ে পড়াশুনো নিয়ে ঠাট্টা করাই তার অভ্যেস ছিলো) হঠাৎ এক-একটা

বইয়ের মধ্যে অতলভাবে ডুবে যেতে—এক ঘণ্টায় একশো পৃষ্ঠা প'ড়ে ফেলতো, যা পড়তো ভুলতো না—দেখেছি তার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে মাত্র-চোখে-দেখা মানুষগুলোর মুখের ছাঁদ, অঙ্গভঙ্গির অবিকল বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। আবার তাকেই দেখেছি দু-পাশে দুটো কদর্য স্ত্রীলোককে ঝুলিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে যেতে, সন্ধেবেলা মল্লিক বাজারের সামনে রিকশায় এলিয়ে প'ড়ে যেতে দেখেছি—গাড়ি ক'রে বাড়ি নিয়ে আসতে-আসতে অকথ্য গাল শুনেছি তার মুখে। এক রাত্রে একশো টাকাও উড়িয়ে দিয়েছে, আবার ময়লা জামা-কাপড়ে পাংশু মুখে পাব্লিশরের দরজায়-দরজায় ঘুরেছে কতদিন, নোংরা গলির শুঁড়িখানায় ন-আনা দামের কালো বিয়ার নয়তো আরো নিকৃষ্ট কিছু গিলে, রুগ্ন, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত হ'য়ে ফুটপাতের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে। আমি কতদিন লুকিয়ে তার স্ত্রীর হাতে টাকা দিয়ে এসেছি—নয়তো কালকের চাল কেনা হয়নি।

একদিন—বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা—তার কাছে উপন্যাসের কিস্তি কিছুতেই আদায় করতে না-পেরে আমি একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছিলুম। যেদিন কাগজ বেরোবার কথা তার আগের দিন সন্ধেবেলা এসে বললে, 'এখনই লিখে দিতে পারি, যদি এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আর এক টিন সিগারেট দাও।' তা-ই দিলুম, আমার আপিশেরই একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলুম তাকে। ভোরবেলা টেবিলের উপর খালি বোতল, কয়েকটা সিগারেট আর এক তাড়া কাগজ রেখে বাস্-এ চ'ড়ে বাড়ি চ'লে গেলো। সেদিন মনে-মনে খুব তারিফ করেছিলুম তাকে, তার জন্য ভয়ও পেয়েছিলুম।

সে-লেখাটা ভালো হয়েছিলো, কিন্তু আমার কাগজে ঐ তার শেষ লেখা। আমি রাগ ক'রে কিছুদিন আর লিখতে বলিনি তাকে, আর

এমনিতেই তার লেখা ক্রমশ ক'মে এলো। মদের নেশা প্রথমে তাকে প্রেরণা জোগাতো—কিন্তু সেই ধার ক্ষ'য়ে যাবার পর অবসাদের কথা ভাবেনি সে। শেষের দিকে টাকার অভাবে তাকে মরীয়া হ'তে হয়েছিলো। একই লেখা দু-জায়গায় বেচেছে, একই বইয়ের কপিরাইট দু-জনকে। আর মাঝে-মাঝে বাধ্য হ'য়ে দু-একটা যা লিখেছে তা না-লিখলেই ভালো ছিলো। আস্তে-আস্তে সকলেই বুঝতে পারছিলো বীরেশ্বর গুপ্তর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

এই সময়কার খবর আমি ভালো জানি না, তার সঙ্গে শেষের দিকে তেমন আর যোগাযোগ ছিলো না আমার। মাঝে একবার তার মোটর-অ্যাক্সিডেন্টের কথা কানে এসেছিলো, কিন্তু সঠিকভাবে কিছুই জানতে পারিনি, কেননা ততদিনে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে গেছে ; যুদ্ধ শেষ, রাজত্বের বদল আসন্ন ;—এক সাময়িক ও সুবৃহৎ ব্যভিচারের আঘাতে আমাদের স্থায়ী, ব্যক্তিগত সম্বন্ধগুলোকে টিঁকিয়ে রাখা শক্ত হ'য়ে উঠেছে। জনতার আন্দোলনে মানুষকে আমরা প্রায় ভুলেছিলাম সেই সময়ে ; বীরেশ্বরের খবর নেয়া হ'য়ে ওঠেনি ; চারদিকের তোলপাড়ের মধ্যে আস্তে-আস্তে তার নামের উপরেও অন্ধকার নেমে এলো। আমি অবশ্য প্রায়ই ভেবেছি তার কথা, নিত্যই আশা করেছি সে আবার সামলে উঠবে—কিন্তু সে-জন্য কোনো চেষ্টা করিনি। এই কথাটা ভাবতে এখন আক্ষেপ হয় ; মনে হয় সময় থাকতে তার পার্শে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো এই ভয়াবহ পরিণতি ঘটতো না।—কিন্তু না, আমার কিছুই করবার ছিলো না, কারোরই কিছু করবার ছিলো না। সে যা লিখেছে ঠিকই লিখেছে : এ-রকম হ'তেই হ'তো ; দারিদ্র্য, দুঃখ, ব্যাধি, শূন্যতাবোধ—সবই তার স্বকৃত, যেমন তার লেখাগুলো তার নিজের ঠিক সেই রকমই। আমরা কেউ তার বইগুলো

যেমন লিখতে পারতুম না, তেমনি তার জীবনকে গড়াও আমাদের সাধ্য ছিলো না। সবই তার নিজের হাত। অনেকবার অনেক চাকরি পেয়েছে, একটাতেও টিঁকে থাকেনি। নিয়মিত লিখতে রাজি হ'লেও এ-রকম অর্থাভাব তার হ'তো না। তার ভালোমানুষ স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হবার মতো সহনশীলতা ছিলো না তার—আর সেইজন্যেই সন্তানের জন্ম দিয়ে মনে-মনে লজ্জিত ছিলো। হয়তো—তার বাবার সঙ্গে তার সম্বন্ধের জন্য—সে যে নিজেই আবার বাবা হয়েছে—সেই চিন্তাটাও তার অসহ্য ছিলো। কোনোভাবেই মানিয়ে নিতে পারলো না নিজেকে—জীবনকে ক্ষমা করতে পারলো না কোনোদিন, নিজেকেও না। কে তাকে বাঁচাতে পারতো সর্বনাশ থেকে ?

আমি পুরোনো আমলের মানুষ ; আত্মায় বিশ্বাস করি, আত্মার জন্য প্রার্থনাতেও বিশ্বাস করি। অনেকদিন পর বীরেশ্বরের এই লেখা প্রকাশ করতে গিয়ে আমি ঈষৎ বিচলিত বোধ করছি। কত রকম লোক পড়বে এটা—কী ভাববে তারা ? আপনাদের যার যা ইচ্ছে বলবেন, আমি তর্ক করবো না। শুধু এই কথাটি ব'লে শেষ করি : বীরেশ্বরের মতো মানুষের সঙ্গে কেউ যেন মেয়ের বিয়ে না দেয়, কিন্তু তার মতো লেখককে ভালো না-বেসে তো উপায় নেই আমাদের। মানুষের জীবনের একটা অংশ চায় সুখ-শান্তি—আর একটা অংশ চায় আত্মার সমৃদ্ধি—আর সেই সম্পদ জোগাবার জন্য মাঝে-মাঝে কয়েকটা মানুষ যদি জ্ব'লে-পুড়ে ম'রে যায় তাহ'লে সেই উজ্জ্বল আত্মাহুতির দিকেই মুগ্ধ চোখে আমরা তাকিয়ে থাকি।

এক

তাহ'লে তা-ই হ'লো। শেষ পর্যন্ত তা-ই হ'লো তাহ'লে। আমাকে ওরা ধ'রে ফেললে, আমাকে ওরা ভালোবাসলে ; সভা ডাকলো, চাঁদা তুললো আমার জন্য, ডাক্তার দেখালে, পাঠালে হাসপাতালে, আর তারপর, তারপর কলকাতার বাইরে এই 'আরোগ্য-নিকেতন'। এখানে —ধন্যবাদ আমার বন্ধুদের !—আমার জন্য স্পেশাল বন্দোবস্ত হয়েছে ; ঐ দেয়াল-তোলা গোলাপি রঙের তেতলা বাড়িটা—যেটা দেখাতে হ'লে স্টেশনের বাবুরা একই সঙ্গে ভুরু আর আঙুল তোলেন—তার বাইরে বেশি দামের আলাদা ঘরে জায়গা হয়েছে আমার, স্প্রিং-এর গদির ধবধবে বিছানা, পরিষ্কার চেয়ার-টেবিল, ধোপ-দুরস্ত চাকর, ট্রেতে ক'রে সাজিয়ে-আনা মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, ফল আর একটি আধা-বয়সি নার্স যাকে প্রায় সুশ্রী বলা চলে…আর অবশ্য সকালে বিকেলে রাত্রে দুপুরে ডাক্তারের আনাগোনা। বড়ো, মেজো, ছোটো ডাক্তার। ভদ্রতা, যতদূর হ'তে হয় ; যত্ন, যতদূর হ'তে হয়। এমনকি, আমি যে একজন লেখক (বা কোনোকালে ছিলুম) তা পর্যন্ত এঁরা জানেন দেখছি।

এই রকম হালে-চালে আমি কখনোই থাকিনি জীবনে। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেরই অবাক লাগছে, ফরশা জামা-কাপড়, রোজ স্নান করছি (না-করলে ওরা জোর করবে ব'লে নয়, তাতে কিছু সময় কাটে ব'লে), আর মাত্র দিন দশেক নিয়ম-মতো খাওয়া-দাওয়ার ফলে এর মধ্যেই নাকি ওজন বেড়েছে আমার। অবশ্য আমার 'বর্তমান অবস্থা'য়

ওজন বাড়া ভালো না মন্দ জানি না; আর আমি অবশ্য সে-রকম কলুষিত, হীন আত্মার মানুষ নই (কোনোকালেই ছিলুম না) যারা শরীরের ওজনবৃদ্ধিকেই সুলক্ষণ ব'লে মনে করে। আর তাছাড়া আমার এখন ভালো হোক বা মন্দ হোক, তাতে আর কিছুই এসে যায় না আমার, নিজের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে গেছি আমি, এতদিনে অদৃষ্টকে জয় করেছি।

শেষের কথাটা লিখে একটু ভাবতে হ'লো। যদি এ-লেখাটা কখনো কারো চোখে পড়ে (সে-রকম সম্ভাবনা কম, কিন্তু বলা যায় না—আমি হয়তো শেষ মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলতে ভুলে যাবো, আর পাব্লিক নামক মাংসপিণ্ডের আর গুণ না থাক কৌতূহল নামক ছার গুণ পুরো-মাত্রায় আছে)—যদি কখনো কারো চোখে পড়ে তারা হয়তো এটাকে মানসিক জড়তা ব'লে ভুল করবে, যাকে বলে 'আপাথি', মানে নিঃসাড়তা, যার বাড়াবাড়ি হ'লে সেটাকে মানসিক ব্যাধির মধ্যে ধ'রে থাকেন ডাক্তাররা। তাই এক্ষুনি আমার কথাটা পরিষ্কার ক'রে ফেলি: যখন বলি, ভালো-মন্দে আমার আর কিছুই এসে যায় না, তখন আমি এ-কথাটাই বলতে চাই যে 'ভালো' আর 'মন্দে'র তফাৎটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি এখনো, এই সর্বজনস্বীকৃত বিশ্ববিশ্রুত ভেদরেখার অস্তিত্ব, অনেক খুঁজেও, আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে আজ পর্যন্ত আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, এই জগতে ভালো বা মন্দ ব'লে কিছু নেই, আছে শুধু শক্তি, ক্ষমতা; সেই শক্তি যখন আমার অনুকূল কর্ম করে, তাকে 'ভালো' বলি, আর সে যখন আমার বিরুদ্ধে যায় তখনই তাকে 'মন্দ' ব'লে অভিহিত করি। 'আমি' মানে এখানে কোনো ব্যক্তি হ'তে পারে, হ'তে পারে কোনো সংঘ বা সমাজ, বা সমাজের কোনো প্রতিষ্ঠান। আর অনুকূল কর্ম

তাকেই বলে যেটা বেঁচে থাকার সহায়ক, নিতান্ত জৈব অর্থে, জান্তব অর্থে বেঁচে থাকা। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের এত মূল্য যে তার আয়ুর উপরে নির্ভর ক'রেই বিশ্বের কোনো আদিসত্য নির্ধারণ করা যায়? পৃথিবীতে, শুনতে পাই, গণ্ডা চারেক জাঁকালো সভ্যতা পর-পর ধ্বংস হ'য়ে গেছে, কিন্তু তাই ব'লে কি সমুদ্রের জলে লবণ ক'মে গেছে, না কি আগুন আর আগের মতো তাপ দেয় না?

যদি আমরা শুধু বাঁধা বুলির মোদক ছেড়ে নিজের চোখ দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, তাহ'লেই আর সন্দেহ থাকে না যে ভালো আর মন্দ আসলে একই বস্তু, একই বস্তুর দুটো প্রকাশ—ঠিক তাও নয়, একই পূর্ণসংখ্যার দুটো অর্ধেক যেন, একটাকে না-হ'লে অন্যটার চলে না, যাকে আমরা সাধারণত 'সত্য' ব'লে থাকি তার মধ্যে ঐ দুটোরই তেজ সমানভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। মোটরগাড়িতে যে চেপে বেড়ায় তার কাছে সেটা 'ভালো', যে-মানুষটা চাপা পড়ে তার কাছে? জাপান যখন বাণিজ্যে খুব উন্নতি ক'রে ফেললে, আমরা সবাই বাহবা দিলুম তাকে, কিন্তু যখন সে যুদ্ধে হেরে কোমর ভেঙে কাৎ হ'লো আমরা বললুম সেটা তার দুর্মতির ফল। কিন্তু দুর্মতি কেন? যে-কারণে সে উন্নতি করেছিলো, সেই কারণেই তাকে যুদ্ধে নামতে হ'লো; যে-কারণে পৃথিবীর মধ্যে জর্মনির কীর্তির তুলনা নেই, সেই কারণেই হিটলারের মতো রাক্ষসকে জন্মাতে হ'লো সেখানে। এ তো খুব সোজা কথা, অঙ্কের মতো সরল আর অনিবার্য। মানুষের কল্পনা যে-কালে সতেজ ছিলো, যতদিন পর্যন্ত পরিবার, সমাজ, ধর্ম আর রাষ্ট্রের চাপ তার মনটাকে আধ-মরা ক'রে ফেলেনি, ততদিন সে তার আদিম কাদা নিয়ে যত রকম খেলা করেছে তার মধ্যে কোনো ধাপ্পা দেয়নি; ততদিন সে দেখিয়েছে অসুরের সাহায্য ছাড়া সমুদ্রমন্থন হয় না, আর

দেবতারা যদি-বা জোচ্চোরি ক'রে লক্ষ্মীকে বগল-দাবা করেন তবু অসুরের আক্রমণের ভয়ে স্বর্গ চিরকাল তটস্থ থাকবেই; দেখিয়েছে, স্বর্গ থেকে কচের মতো স্পাই পাঠালেও দৈত্যকুলের মরণ-বাণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কেননা লক্ষ্মী দেবী স্বাস্থ্যের অনুপান জানলেও হৃদয়-হরণের মন্ত্র জানে শুধু দানবকন্যা। এবং হৃদয় যেখানে প'ড়ে থাকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়। এই রকম সব গল্পের মধ্য দিয়ে পুরোনো মানুষ—আসলে তারাই নতুন মানুষ, কেননা পৃথিবীটারই বয়স তখন কম ছিলো—তারা যা বুঝিয়ে দিয়েছিলো আমরা আজকাল অনেক বিদ্যে শিখে তা ভুলতে বসেছি; আমরা ভাবছি, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে পাওয়া যায়; এমন এক জগতের কথা ভাবছি যেখানে এরোপ্লেন থেকে আর বোমা পড়বে না, আর অ্যাটমের জোরে এরোপ্লেন চলবে কিন্তু কোনো নগর ধ্বংস হবে না কখনো। কী বোকার মতো কথা! কী মর্মান্তিক ছেলেমানুষি! বৃদ্ধি মানেই ক্ষয়: এ-ই তো জগতের একমাত্র প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য। ফুলটা ফল হ'য়ে ওঠে সে তো ঝ'রে পড়ারই জন্য। শিশু যুবক হ'লো; তার মানে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হ'লো সে। মৃত্যুর দুয়ার অসংখ্য; লক্ষ দরজায় খিল দিলেও আরো অনেক রাস্তা আছে তার। মহামারী আর দুর্ভিক্ষ দূর করো; যুদ্ধ থামিয়ে দাও, চারদিকে সব ভালো হোক—তখন ক্লান্তিতে, ক্লান্তিতে, ক্লান্তিতে ম'রে যাবে মানুষ, পাগল হ'য়ে গিয়ে পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়বে। ঐ যাকে তোমরা ভালো বলো, তার মতো ক্লান্তিস্কর আর-কিছু নেই।

মাঝে-মাঝে আমারও অসতর্ক মুহূর্ত আসে। দু-দিন আগে, কী-রকম মনের ভুলে, ডক্টর ঘোষের সামনেই এই ধরনের কথা ব'লে ফেলেছিলাম। প্রায়ই আসেন তাঁরা, কথা বলেন, আমাকে দিয়ে কথা

বলান। আমি বুঝি সবই : এই আমার 'চিকিৎসা' হচ্ছে। আমার গোপন মন জেনে ফেলার জন্য চারদিকে ফাঁদ পাতছেন ওঁরা। আধুনিক গোয়েন্দা-পুলিশের রকমফের আরকি—হাতে মারেন না, শুধু প্রশ্নের ইস্কুরুপটাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে অন্ত্রতন্ত্র অবধি পৌঁছিয়ে দেন, যতক্ষণ-না ধরা-পড়া মানুষটা প্রাণের দায়ে কিছু-একটা স্বীকার ক'রে ফেলে। কিন্তু আমিও কি কম শেয়ানা! বলবো না, কিছু বলবো না, বাজে কথা ব'লে সাবোটাজ ক'রে দেবো তোমাদের। আমাকে ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে দেবে ভাবছো? ফেলে দেবে ধুলো-বালি, মাকড়শার জাল, পচা ইঁদুর, ডিমসুদ্ধ আরশোলা? আর সেই সঙ্গে, সে-ই যে আমার এক টুকরো রত্ন, যা ছাড়া আর-কিছুই নেই আমার, তাও ঝেঁটিয়ে দেবে? না, না, না। আমার মনের সব 'পাপ' বেঁচে থাকবে—যতদিন আমি আছি। আমাকে কি নারকোলের খোল হ'য়ে বেঁচে থাকতে বলো? নির্দোষ ডাবের জল হ'য়ে? লাল-গালের, নরম-গলার ভালোমানুষ হ'য়ে? আমার সেই গভীর জলের মাছ, রুপোলি মাছ, সোনালি মাছ, রামধনু-রঙের মাছ, তাকে তোমরা ছুঁতে পাবে না কোনোদিন, চোখেও দেখবে না। আমিও তাকে দেখিনি ; কিন্তু সে মাঝে-মাঝে ঘাই মারে ব'লেই তো বুঝতে পারি যে আমি—আমি।

বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলুম সেদিন। ডক্টর ঘোষ বললেন, 'আপনি দার্শনিকের মতো কথা বলেন। শুনলে শিক্ষা হয়। তারপর?'

'তারপর? আর-কিছু না।'

'কিন্তু কখনো আপনার মনে হয়নি যে অমুক জিনিশটা ভালো আর অমুকটা ভালো না?'

'তা কেন হবে না?' আমি হাসলুম। 'স্কচ আর সোলানে তফাৎ বোঝে না এমন মোটা তারের মানুষ কেউ আছে নাকি? আর

আপনাদের অমলা নার্সের চেহারাটি ভালো, তা দেখবার মতো চোখও আমার আছে।'

'আপনার এখানে ভালো লাগছে তাহ'লে? সুখের কথা। আর-কিছু দরকার হয় তো বলবেন।'

'সে তো আগেই বলেছি। দাড়ির চুলকোনি সহ্য হয় না আর।'

'হবে, হবে।' এই ব'লে ডক্টর ঘোষ বিদায় নিলেন। আর তিনি যাওয়া মাত্র আমি বিছানাটায় চিৎ হ'য়ে পড়লুম; এই সব কথাবার্তার পর খানিকক্ষণ শুয়ে না-নিলে চলে না।

এই বিছানাটাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এমন নরম, এমন গভীর, আমার নড়াচড়ার ভাঁজে-ভাঁজে এমন সুন্দর সায় দেয়, যখন আমি একমনে কিছু ভাবি চুপ ক'রে থাকে, যখন অলস হ'য়ে আড়মোড়া ভাঙি মৃদু-মৃদু কেঁপে ওঠে—তার সঙ্গে আমার ঠিক-ঠিক বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে যেন। 'একা, একলা ঘরে এই রকম বিছানায় সেরেফ শুয়ে থাকার মধ্যে যে-আরাম আছে, তা কিন্তু—সত্যি বলতে—আমি কল্পনাও করিনি আগে। আমি ধ'রেই নিয়েছিলুম যে শোয়া মানেই নোংরামি—ছেঁড়া কাঁথা, শিশুর দুর্গন্ধ, চ্যাঁচামেচি, নানান বয়সের ছেলে-পুলে, আর তারই মধ্যে, রাত গভীর হ'লে, একটা মোটা, মূর্খ, অকাল-বৃদ্ধা শূকরীর মতো স্ত্রীর শরীর। যে-সব মেয়েরা হাতে-হাতে নগদ নেয় তারা অন্তত শরীরটাকে মাজা-ঘষা করে, তারা অন্তত ভান জানে, ভঙ্গি জানে—এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টার জন্যও ভুলিয়ে রাখতে পারে তারা। তার উপর নগদ দাম নিয়েই ছেড়ে দেয়, সারা জীবন আঁকড়ে থাকে না।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, ওখানেই ফিরতে হয়—ঐ নোংরামির মধ্যেই। ঐ ছেলেপুলের জন্য আমি দায়ী, ঐ দারিদ্র্যের জন্য আমি দায়ী, সব

জানি। কিন্তু কী করবো, বলো, যদি সহ্য না হয়? সহ্য হয় না; যা-কিছু নিয়ে তোমরা হৈ-চৈ করো, গান বানাও, বক্তৃতা লেখো—বাড়ি, দেশ, সমাজ, জাতি—কিছুই সহ্য হয় না আমার। যেখানে আমি থাকি সেটা আমার বাড়ি নয়, যে আমাকে নিজের ক'রে নিতে পারবে সেই বাড়ি কোথায় আছে জানি না। আর দেশ? দেশ মানে কী? মানুষের জন্ম হয় দৈবাৎ, মানচিত্রের কোনো-একটা বিন্দুতে দৈবাৎ ছিটকে পড়েছি ব'লেই তার মাটিতে মাথা ঠেকাতে হবে? না। কিছুই আমার নয় যা আমাকে উপার্জন করেনি। যে আমার ডাক শোনে না, আমার ভাষা বোঝে না, আমার কথায় নিরুত্তর থাকে, তাকে আমি আমার বলি কেমন ক'রে? কলকাতার ফুটপাতের দিকে তাকিয়ে ত্থাখো: ত্থাখো হিন্দি সিনেমার সামনে কাতারে-কাতারে ভিড়। কী দেখার জন্য ভিড় করেছে? গুণ্ডামি, ভাঁড়ামি, কাঁচুলি-আঁটা স্ত্রীলোক—অশ্লীল হবার যেখানে শক্তি নেই অথচ ইচ্ছে আছে সেই তেলতেলে চিটচিটে ঘেন্না। এদেরকে ভাই ব'লে বুকে জড়িয়ে মাতাল হ'তে হবে? মাপ করুন, মশাই, আমি সোজাসুজি মাতাল হওয়াটাই পছন্দ করি; তাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় জেগে ওঠে, গুমোট ভেঙে ক্ষমার হাওয়া ব'য়ে যায়।

ঐ জিনিশটি এখানে পাওয়া যায় না কিছুতেই। পায়ে ধরলেও ফল হবে না, জানি; আমি তাই নিশ্বাসের অপব্যয় করিনি একবারও। হয়তো আমাকে এ-জন্যেই এখানে পাঠানো হয়েছে যাতে ওঁর একটি ফোঁটাও পেটে না পড়ে। আমার বন্ধুরা ভালো করবেন আমার, ভালো করবেন আমাকে। ভালো, ভালো। কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে? সরকার দেবে, স্বাধীন দেশের সরকার। তা-ই শুনছি। লোকেরা কী বলাবলি করছে তাও শুনছি মনে-মনে। আজ নয়,

অনেকদিন ধ'রেই বলছে। 'অদ্ভুত প্রতিভা ছিলো, কিন্তু উচ্ছন্নে গেলো একেবারে!' 'দারিদ্র্যে নষ্ট হ'লো—কী দুঃখের কথা!' 'অসুখী জীবন—কিন্তু কী-ই বা করা যায়।' করুণা করার সুখ, সেই সঙ্গে আত্মপ্রসাদের চকলানি। আর তারই সুযোগে দিচ্ছি আমি, আমি, বীরেশ্বর গুপ্ত। এর চাইতে ম'রে যাওয়া ভালো ছিলো না?···আর কয়েকটা দিন যাক।

এখানে এসে দাড়ি রাখতে হচ্ছে। কামাবার ক্ষুর ওঁরা দেবেন না কিছুতেই। কিন্তু ঠেকাতে পারবে ভাবছো? কতটুকু জানো তোমরা আমার? আমিও একটা হাসি লুকিয়ে রেখেছি আস্তিনের তলায়, সব-শেষের প্রচণ্ড এক হাসি। আর ইতিমধ্যে, দাড়ি গজিয়ে ঋষির মতো চেহারা করবো, চুকচুক ক'রে খাবো তোমাদের জোলো চা, অমলা-নার্সের বাড়ি থেকে রেঁধে-আনা লাউয়ের শুক্তো মেখে ভাত খাবো, আর মাঝে-মাঝে এমন এক-আধটা ঠাট্টা করবো যাতে অমলা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে। বেশি লাল হয় না; ঝানু মেয়ে, মনে হয়। তাকে বলবো নাকি—'তোমাকে নিয়ে নবদ্বীপে পালিয়ে গিয়ে কণ্ঠি-বদল করবো, যদি আমাকে একটা বোতল স্কচ এনে দিতে পারো। হুইস্কির বদলে যদি খাঁটি দাও তাহ'লে কিন্তু কণ্ঠি-বদল হবে না—তবে অন্য সবই হতে পারে।' হঠাৎ চোখ টিপে ধরবো পিছন থেকে?

ঠাট্টাটা মন্দ না তেমন—ভেবে নিজেরই হাসি পাচ্ছে। কিন্তু কী নিকৃষ্ট কাজ—এই মনে-মনে ঠাট্টা তৈরি ক'রে নিজেই তাতে হেসে ওঠা, যেন নিজের মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে তা-ই খেয়ে বেঁচে থাকার মতো। কিন্তু সেই দুর্দশাই তো হয়েছে আমার এখন। দিনের বেলাটা যা-হোক একরকম কেটে যায়, কিন্তু সন্ধের পরে মদ না-খেয়ে মানুষ বাঁচে! ছ-টার সময় রাতের খাওয়া এনে দেয়; তারপর সন্ধে হয়,

অন্ধকার নামে, চারদিক মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ, এই ঘরের মধ্যে মুখোমুখি বসে থাকি আমি—আর সময়। জন্তুর মতো সময়, হিংস্র চোখে গুঁড়ি-মেরে-তাকিয়ে-থাকা পশুর মতো, আমি তার শিকার, ভয়ে-জ'মে-যাওয়া ভেড়ার মতো কাঁপছি তার সামনে। আজ প্রথম নয়—অনেক, অনেকদিন আগেই এই অনুভূতি হয়েছে আমার, আমার বয়স যখন উনিশ, কুড়ি বা পঁচিশ, তখন থেকেই: তখন থেকেই আমি বুঝেছি সময়ের মতো শত্রু আর নেই আমাদের। কী ভয়ানক তার ভার, কী অসহ্য একগুঁয়েমি। এই ভার যে তুলে নিয়েছে, এই জন্তুকে যে বধ করেছে, সেই অস্ত্র আর বর্মের নামই মদ। এই কথাটা সুধা কোনোদিন বোঝেনি। বুঝবে ব'লে আশাও করিনি আমি—সে আমার স্ত্রী ব'লে আশা করিনি তা নয়, সে মেয়ে ব'লেই অনেক জিনিশ তার ধারণার বাইরে। অবসাদ, নিঃসঙ্গতা, সময়ের ভার—এই অভিশাপগুলো পুরুষের; মেয়েরা তার আভাস পাবে কেমন ক'রে? কেননা এই পৃথিবীতে শুধু মেয়েরাই সুখী হ'তে পারে, শুধু বেঁচে থেকেই সুখী হবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তাদের। তারা জিগেস করে না কেন বাঁচবো? কিসের জন্য?—আর তাই, তাদের মনের উপর কখনোই সেই বিরাট শূন্যতা নেমে আসে না, যার চাপে আকাশ আর পৃথিবীটাকে ধোঁয়ার মতো ধূসর মনে হয়, নিশ্বাসের বাতাসের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। আর তোমরা, যারা এই বিষের আক্রমণ একবারও সহ্য করোনি, তোমরাও নিজেদের ঈশ্বরের বরপুত্র ব'লে ভেবো না; ভেবে দেখো তোমরা ছেলেবেলা থেকেই ঐ বিষের টিকে নিতে-নিতে বড়ো হয়েছো কিনা—সাধারণতার টিকে, সাংসারিকতার টিকে, জীবনে 'উন্নতি' করার টিকে—ভেবো দেখো, এই যে বছরের পর বছর পৃথিবীর হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছো, তার মধ্যে কতটুকু সত্যিকার বেঁচেছো তোমরা। যেখানে

প্রাণ আছে তারই আশে-পাশে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায় ; জড়বস্তুকে স্পর্শ করে না।

—এই শত্রুকে ফাঁকি দেবার জন্য, আর কোনো উপায় না-দেখে, অগত্যা আবার কলম হাতে নিতে হ'লো। অনেকদিন পর, আবার। ঘুমের ওষুধ চেয়েছিলুম ; তাও আর দেবে না আমাকে ; বলে, 'আর দরকার নেই।' পড়ার জন্য ছবিওলা পত্রিকা দিয়ে গেছে, হাসির গল্পের বই, যাকে ওরা বলে 'লাইট রীডিং'। কিন্তু বীরেশ্বর গুপ্ত এত নিচে কখনোই নামবে না যে রাজনৈতিক, খেলোয়াড় আর নটীদের ছবি দেখে সময় কাটাবে। তার চেয়ে ব'সে-ব'সে মুহূর্তগুলোকে লক্ষ্য করা ভালো—কোন এক অনন্ত উদর থেকে বেরিয়ে আসছে একে-একে, কৃমির মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে চলছে—আস্তে, কী ভীষণ আস্তে! কিন্তু এখনো, এখনো একটা পথ খোলা আছে আমার, মুক্তির একটা সরু রাস্তা, দম-বন্ধ-করা কম-হওয়ার পথ, কিন্তু সইতে পারলে মদের চেয়েও পরাক্রান্ত। আর তাই, এই নিঝুম রাতে (আসলে হয়তো ন-টাও বাজেনি) ব'সে-ব'সে লিখছি।

দুই

শাদা বাংলায় কথাটা এই যে আমাকে ওরা পাগলের চিকিৎসালয়ে পুরেছে। কিন্তু সত্যি কি আমি পাগল? এ-কথার উত্তরে আমি বলবো, হ্যাঁ। এবং না। অর্থাৎ, আমি বরাবর যতটা পাগল ছিলুম এখনো সেই রকমই আছি, আগে আমাকে 'স্বাভাবিক' ব'লে ভাবাটা যেমন ভুল হয়েছিলো, এখন 'পাগল' বলাটাও ঠিক তেমনি ভুল হবে। আর এই যে আমরা কথাটা বলি—'স্বাভাবিক'—তার মানেই বা কী? 'স্বাভাবিক', 'প্রকৃতিস্থ': তার মানে, যে নিজের প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে। কিন্তু ঠিক-ঠিক নিজের প্রকৃতির চাহিদা মেনে কে চলতে পারে এই সভ্য সমাজে, শুনি? কেউ পারে না। বেশির ভাগ মানুষ নিজেকে দশের মাপে ঢালাই ক'রে নেয়—নিজের প্রকৃতিকে ছেঁটে-কেটে সামাজিক মানুষ হ'য়ে ওঠে তারা। তারাই সবচেয়ে 'প্রকৃতিস্থ' মানুষ, সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই প্রকৃতি তাদের নিজেদের নয়, সমাজের। কেউ-কেউ তা পারে না; নিজের প্রকৃতির প্রবলতার মধ্যেই হাবুডুবু খায় সারা জীবন। আসল অর্থে তারাই ঠিক 'প্রকৃতিস্থ', কিন্তু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেলে প্রতিবেশীরা সহ্য করতে পারে না আর, পুলিশম্যানের হাতে সঁপে দেয়। আমিও সেই বাড়াবাড়ি করেছিলুম।

করেছিলুম একরকম ইচ্ছে ক'রেই। ব্যাপারটাকে একটা চরমে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিলো আমার, নয়তো আর টেঁকা যাচ্ছিলো না। মনে করা যাক আমার প্রকৃতির মধ্যে জোরালো

কয়েকটা খিদে আছে : ঐশ্বর্যের খিদে, সৌন্দর্যের খিদে, প্রেমের, আর রাজত্বের। এখন আকবর বাদশার মন নিয়ে যদি হরিপদ কেরানি জন্ম নেয়, তবে তার উপায় কী। কিন্তু ঠিক বলা হ'লো না, ঠিক তাও নয়, হরিপদ কেরানির সঙ্গে তফাৎ আছে বইকি আমার। জয় করার ইচ্ছে শুধু নয়, তার উপায়ও আছে আমার হাতে। অন্তত—ছিলো, এসেছিলো একবার। একটিমাত্র উপায় : তার নাম, লেখা। একবার, জীবনে একবার, আমার মনে হয়েছিলো বই লিখেই জগৎটাকে জয় করতে পারি আমি। পারি, মনের বন্য জানোয়ারগুলোকে পোষ মানিয়ে সার্কাসের মতো কসরৎ দেখাতে। সেই সময়েই কয়েকখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছিলুম পর-পর। ঝোঁকে লিখেছিলুম, তোড়ে লিখেছিলুম, একটু ভাবতে হয়নি, একবার হোঁচট খাইনি। একটা দম-আটকানো টান পড়েছে বুকের মধ্যে, রাশ-টেনে-রাখা রেসের ঘোড়ার মতো টলমল করছি—এমনি মনে হ'তো। আর তারপর—তারপরই তার ছিঁড়ে গেলো।

আমার অবশ্য এ-কথা বুঝতে দেরি হয়নি যে সত্যিকার লেখক আমি নই। তার মানে, আমি সে-জাতের মানুষ নই যারা পটের উপর তুলি বুলিয়ে বা কাগজের পাতে অক্ষর এঁকেই নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দিতে পারে, আর তার মধ্য থেকেই নিংড়ে বের করে বেঁচে থাকার অর্থ, সার্থকতা। ও-রকম মানুষের প্রধান লক্ষণ হ'লো ধৈর্য আর পরিশ্রমের ক্ষমতা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কামাই না-ক'রে, প্রেরণার জন্য অপেক্ষা না-ক'রে, থপ্ থপ্ গাধার খাটুনি টেনে যাবার ক্ষমতা। কিন্তু আমার ধাত ঠিক তার উল্টো ; যা সহজে পারি না তা আমি কিছুতেই পারি না, যে-মুহূর্তে ঠেকে গেলো সে-মুহূর্তেই সেটাকে আমি ছেড়ে দিই। মানে—লেখাটা যতক্ষণ আমাকে মাতাল ক'রে রাখতে

পারে ততক্ষণই লিখতে পারি আমি, কিন্তু এমন কোন মদ আছে যার নেশা কখনো কাটে না?

আর তাছাড়া, কাজ হিশেবেও ওটা ঠিক পছন্দ হয় না আমার। সারাদিন শান্তভাবে চেয়ারে ব'সে, কাগজের উপর ঘাড় গুঁজে প'ড়ে থাকা—নিজেকে অনেকগুলো টুকরোর মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে তাদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রণয় প্রতিযোগিতা চালানো—এই কি লাল-রক্ত-ওলা পুরুষের কাজ? তার তো বেরিয়ে পড়ার কথা ঘর ছেড়ে—আগল ভেঙে বেরিয়ে পড়বে সে পৃথিবীতে, মনে-মনে নয়, শরীর নিয়ে, কল্পনায় নয়, রক্তমাংসের বাস্তবে—রোদের আঘাতে, ঢেউয়ের দোলাতে, সমুদ্র আর প্রান্তরের তীক্ষ্ণ বিজয়ী বাতাসের মধ্যে। ঐ রকম কোনো কাজ পেলে বোধহয় মনের মতো হ'তো আমার; কোমরে ছোরা গুঁজে সোনার সন্ধানে অজানা সমুদ্রে ভেসে পড়া, সোনার সন্ধানে অজানা দেশের পাহাড় ডিঙোনো। আগুন, রক্ত, হত্যা: তারই মধ্য দিয়ে নতুন জন্ম পৃথিবীর। নিদেনপক্ষে, একটা ছোটোখাটো দ্বীপের রাজা হ'তে পারতুম যদি, যদি পারতুম একশো রূপসীর প্রণয়ী হ'তে! কোনোটাই হ'লো না; তাই নেহাৎই শুধু লেখক হ'তে হ'লো।

আমার পূর্বপুরুষের নিবাস ছিলো নোয়াখালি জেলায়। সেখানকার মানুষের মধ্যে মিশোল কিছু বেশি। আমার সন্দেহ হয়, আমার কোনো প্রপিতামহী কোনো পর্তুগীজ বোম্বেটের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাই আমার রক্ত এত চঞ্চল। অবশ্য এই সন্দেহের কোনো কারণ নেই আমার, কোনো পারিবারিক কানাঘুষো শুনিনি কোনোদিন, তাছাড়া বংশতালিকায় চরিত্রলক্ষণ খুঁজতে যাওয়া, আমার মনে হয়, হাতের উপরকার রেখার মধ্যে ভাগ্যনির্ণয় করতে যাওয়ার মতোই বোকামি। তবে কথাটা এই যে আমি ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু

পড়েছি (বেশি পড়িনি) তার মধ্যে আমার মনকে সবচেয়ে জোরে নাড়া দিয়েছে দস্যু-নাবিক-আবিষ্কারকদের বিবরণ : কলম্বাস, দিয়াজ, ভাস্কো দা গামা, বালবোয়া—কত ভাগ্য এঁদের, নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার জন্য এঁরা পেয়েছিলেন—ভাবনা নয়, কল্পনা নয়, ভাষা নয়—একেবারে সসাগরা পৃথিবীটাকেই পেয়েছিলেন। লোভী এরা, দস্যু এরা, এদের ব্যবহারকে পৈশাচিক বললে ভুল হয় না, কিন্তু দস্যুতাকেই বিরাট আকার দিতে পারলে মানুষ হ'য়ে ওঠে বীর, সম্রাট, মহাপুরুষ। এই উজ্জ্বল বীর বংশের শেষ অবতার নেপোলিয়ন ; কিন্তু তাঁর সময়ের পরেই পৃথিবীটা কুঁকড়ে গেলো, বুড়ো হ'য়ে গেলো, পরোপকারী কমিটির হাতে চ'লে গেলো, ও-রকম রাজত্ব করতে কেউ আর পারলো না তার পরে, না হিটলার, না ট্রটস্কি, না, এমনকি, গান্ধী। বীর আর পীর, মানুষের এই দুটো ধারাই নির্বংশ হ'য়ে গেছে, কিংবা আমরা তার অযোগ্য হ'য়ে গেছি ; বীরকে আমরা গুণ্ডার স্তরে নামিয়ে আনি, মহাত্মাকে হ'তে হয় পলিটিশিয়ান। এখন সাধারণ মানুষের যুগ—সাধারণ, সাধারণ, সাধারণ মানুষের। সাম্যের যুগ এখন, আর সাম্যের নীতি সাধারণ মানুষের পক্ষে উত্তম প্রস্তাব, সন্দেহ নেই।

এই সেদিন মানুষ এভারেস্টের শিখরে আরোহণ করলো। এই শেষ ভূখণ্ড (যদি সেই তুষার-চূড়াকে 'ভূখণ্ড' বলা যায়), যেখানে আদিযুগ থেকে মানুষের পা পড়েনি, তাও পরাজিত হ'লো এতদিনে। খুব ভালো, খুব তারিফ করি আমরা। কিন্তু কী লাভ হ'লো ? মানুষের ইতিহাসে কি এতটুকু রেখা পড়লো তার ? যদি তেনজিং সেখান থেকে সোনার খনির খবর নিয়ে ফিরতেন ! যদি সেই বিশাল নির্জন উর্বর আর বাসযোগ্য হ'তো ! তাহ'লে কী হ'তো ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু না, কিছুই নেই, কাজটা করা গেছে, এইটুকু

মাত্র কথা। উঁচু দরের একটা ক্রীড়া হ'লো যেন—ফুটবল প্রভৃতির চাইতে অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ, বুদ্ধিসাপেক্ষ, শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু একই জাতের জিনিশ। অগত্যা এঁদেরই বলছি বীর। এবং, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য, আছেন বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, ফুটবল চ্যাম্পিয়ন, ফিল্মস্টার, আর ফিল্মের ন্যাকামিপূর্ণ গুণ্ডা, যে ধনীদের উপর ডাকাতি ক'রে গরিবদের বিলিয়ে দেয়! সবই নকল, সবই বদলি: দুধের সাধ ঘোলে মেটানো, বস্তুর বদলে ছায়া নিয়ে মেতে থাকা। আর এই লেখা, তাও কি তা-ই নয়: বাঁচার বদলি, বাস্তবের বদলি, জল হাওয়া রৌদ্রের বদলে অলীকের আলিঙ্গন? বিশেষত এই বাংলা দেশে, যেখানে আকাশের তেজ এত উগ্র যে মানুষের জন্য বেশি কিছু বাকি থাকে না, আর যদি বা থাকে সেই তেজ বেরোবার রাস্তা প্রায় কিছু নেই—সেখানে মানুষের না-লিখে আর উপায় কী। আর-কিছুই নেই ব'লেই এ-দেশে যুবকেরা এত কবিতা আর গল্প লেখে, দুই অর্থেই করুণ সব কবিতা আর গল্প লেখে। তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে তারা ভাবে তারা লিখতে ভালোবাসে ব'লেই লেখে (অনেকে বিয়ের পরে আর লেখে না), আর আমি জানি যে আসল জিনিশের অভাব ঘটে ব'লেই, সেই শূন্যতা ভরাবার জন্য, মাঝে-মাঝে আমাকে লিখতে হয়।

এই কথাটা অল্প বয়সেই বুঝেছিলুম। আমার বয়স তখন ষোলো; পূর্ব বাংলায়, যেখানে মিষ্টি মোটা লাল চালের ধান জন্মায়, সেই রকম একটা গ্রামে চাষার মতো স্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠছি। মনের ত্রিসীমানায় লেখক হবার স্বপ্ন নেই। লেখা এবং পড়া, এ-দুটোর একটাতেও ঠিক সুখ পাই না; সকাল-সন্ধ্যায় স্কুলের বই খুলে বসি বাবার চাবুকের ভয়ে, আর বছর-বছর স্কুলের পরীক্ষায় প্রোমোশন পাই, তাও বোধহয় বাবারই প্রতিপত্তির জোরে। আসলে সময় কাটে বনে-বাদাড়ে ঘুরে,

আখ পেয়ারা জামরুল চিবিয়ে, পাখি ধ'রে, গাছে চ'ড়ে, খালে ডুবিয়ে, ফাঁক পেলেই বড়ো নদীতে একলা ডিঙি বেয়ে। আর পাঁচটা গ্রামের ছেলে থেকে আমাকে আলাদা ক'রে নেবার কিছুই নেই—শুধু একটা লক্ষণ ছাড়া। সেটা এই যে আমার একা থাকতে ভালো লাগে, মাঝে-মাঝেই একা হ'তে ইচ্ছে করে। দল বেঁধে দুরন্তপনা করা হচ্ছে, হঠাৎ আমার জিভের স্বাদ চ'লে গেছে যেন, কিছু না-ব'লে চ'লে এসেছি, পালিয়ে এসেছি, দূরে গাছের ছায়ায় ব'সে দেখেছি কাঠবিড়ালির খেলা, পিঁপড়েদের পরিশ্রমী সংসার। অন্য ছেলেদের সুখের আদর্শ ছিলো কাপাটি, চড়ুইভাতি, সাঁতারের রেস, শীতকালে খেজুরের রস চুরি ক'রে খাওয়া ; ও-সব ব্যাপারে উৎসাহ আমার কম ছিলো তা নয়, কিন্তু যখন একলা ডিঙি নিয়ে নদীর জলে উজান বেয়েছি, চ'লে গেছি মধুগঞ্জের ঘাট পর্যন্ত, যেখানে ভিড় করেছে বড়ো-বড়ো মহাজনি নৌকো, বরিশালের ডাল, চাঁদপুরের শুপুরি আর নারানগঞ্জের পাটের ভারে বোঝাই, আর সেই সঙ্গে বম্বাই মিলের কাপড়, ময়নামতীর শাড়ি, জাপানি গেঞ্জি আর খেলনা—তখন আমার যে-রকম ভালো লেগেছে তার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। ফেরার পথে ভাটির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, ইলিশ ধরার প্রকাণ্ড বেড়াজালগুলোর ধার দিয়ে-দিয়ে ; কখনো জাল টেনে তুলেছে জেলেরা, আর পড়ন্ত রোদে ইলিশের ঝাঁক বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়েছে হাওয়ায়। আমার মুখ পড়েছে পশ্চিমের দিকে ; সেখানে, আমার চোখের সামনে, মেঘে আর সূর্যাস্তে মিশে জল থেকে আকাশ পর্যন্ত ধাপে-ধাপে প্রাসাদ উঠে গেছে, আর আমি মনে-মনে বলেছি, 'ঐ রকম প্রাসাদ একদিন আমার হবে।' আবার কোনোদিন মেঘ এসেছে কালো হ'য়ে; তখন আমি চেয়েছি এমন ঝড় উঠুক যাতে আমাকে আর বাড়ি ফিরতে না হয়।

এ-রকম হবার কারণ ছিলো। একটা দুঃখ ছিলো আমার মনে; সে-দুঃখ—আমার বাবা। তাঁর মতো প্রবল মানুষ আশে-পাশের দশখানা গ্রামের মধ্যে আর ছিলো না। বিরাট লম্বা চেহারা নিয়ে, কুচকুচে ঘন দাড়ি নিয়ে, জ্বলন্ত কয়লার মতো চোখ নিয়ে, খাটো ধুতিতে খালি পায়ে তিনি যখন দাঁড়াতেন, তখন গ্রামের জমিদার থেকে মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলকেই নিচু গলায় কথা বলতে হ'তো। অথচ তাঁর বিষয়-আশয় তেমন ছিলো না; কিছু ধানের জমি, কিছু শর্ষের খেত, আর একটা পানের বোরো আর আম-কাঁঠালের বাগিচা—এই ভাঙিয়েই সংসার চালাতেন। দশ জোয়ানের কাজ করতেন একলা, একটা ঘর ছাইতে একবেলার বেশি লাগতো না তাঁর, তাঁর সঙ্গে ধান কাটতে গিয়ে জাত-চাষিরা পেছিয়ে পড়তো। এই দৈহিক শক্তির সঙ্গে নৈতিক শক্তিরও যোগ হয়েছিলো; মহেশ্বর চাটুয্যের সততা একটা প্রবাদ-বাক্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো সেই অঞ্চলে। কারো কাছে একটা আধলা ধারতেন না কখনো, একটা আধলা বেশি নিতেন না; কারো এমন সাধ্য ছিলো না পাওনা থেকে পাই পয়সা তাঁকে কম দেয়। মাঝে-মাঝে চাষিদের টাকা ধার দিতেন, তার জন্য সুদ নিতেন না, কিন্তু ঠিক সময়ে ফেরৎ না-পেলে এক চড়ে চামড়া ফাটিয়ে দিতেন লোকটার। যে-কোনো মামলায় তাঁর সাক্ষ্য ছিলো শেষ কথা; গ্রামে কখনো পুলিশ এলে তাঁর কথার উপর মরণ-বাঁচন নির্ভর করেছে অনেকের। এবং কেউ কোনো অন্যায় করেছে বুঝলে, বন্ধুকেও ধরিয়ে দেবার মতো কলজে ছিলো তাঁর। তাঁর কাছে অন্যায়ের মাত্রাভেদ ছিলো না; তহবিল তসরুপ করাকে তিনি যত ঘৃণা করতেন, পরের পুকুরে মাছ ধরাকেও তেমনি। এই হিংস্র সততা, এই পাশবিক সাধুতার জোরে সারা গ্রামের উপর একরকম রাজত্ব করতেন তিনি—নিজের পরিবার-

বর্গের তো কথাই নেই। আমার চারটে ছোটো ভাই-বোন তাঁকে যমের মতো ভয় করতো, ভক্তিও করতো ভগবানের মতো। একবার 'বাবা' শব্দ উচ্চারিত হ'লেই তাদের রোমাঞ্চ হয়, তিনি একবার দৃষ্টিপাত করলে মূর্চ্ছা যাবার দশা হয় তাদের। আর দেখে-দেখে আমার ইচ্ছে করে ওদের সব ক-টাকে গলা টিপে মারি।

কেননা, ত্রিভুবনে আর-কিছুই ছিলো না, যাকে আমার বাবার চেয়েও ঘৃণা করতুম আমি। তাঁকে ঘৃণা করতুম, তিনি আমার চেয়ে প্রবল আর কর্মিষ্ঠ আর বুদ্ধিমান ব'লে, তিনি অন্যায়কে অমন ঘৃণা করেন ব'লে ঘৃণা করতুম তাঁকে, কেননা—আমার ধারণা ছিলো—সবচেয়ে বেশি অন্যায় করেছেন, এবং নিত্যই ক'রে থাকেন, তিনি। সে-অন্যায় আমার মা-র উপর।

আমার মাকে আমরা বরাবর ছোটোখাটো মানুষ ব'লে জেনেছি। কিন্তু আসলে, সে-যুগের বাঙালি মেয়ের তুলনায়, তিনি বরং লম্বাই ছিলেন, তাঁর মাথা বাবার বুকের কাছে প'ড়ে থাকে ব'লে বাবার পাশে তাঁকে মনে হয়েছে হাস্যকর রকমের ছোটো, অক্ষম আর দুর্বল। বিশ্রী লাগতো আমার তাঁদের দু-জনকে কাছাকাছি দেখতে; এমন বেমানান কোনো স্বামী-স্ত্রী আমি আর দেখিনি। রঘুর বাবাকে দেখার পর রঘুর মা-কে দেখামাত্র মনে হবে—হ্যাঁ, এই ঠিক!. সুবলের মাকে একবার দেখলে যেন না-চিনেও ব'লে দেয়া যায় যে উনিই তার বাবা। কিন্তু আমার মা-বাবার মধ্যে যেন দিন আর রাত্রির ব্যবধান; এই দু-জন যে একই সঙ্গে একই আকাশে বিরাজ করতে পারেন তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত। গরমিলটা শুধু দৈহিক আকারে নয়; চেহারায়, চরিত্রে, ব্যবহারে, কোনোখানে একফোঁটা মিল নেই দু-জনে। বাবার গায়ের রং কালো; মা-র রং হাতির দাঁতের মতো; বাবা একটা হাঁক

দিলে সারা পাড়া কেঁপে ওঠে, মা-র গলার আওয়াজ ফিশফিশের উপরে ওঠে না; বাবা পুজো-আর্চার ধার ধারেন না, হাড়গোড়সুদ্ধ পাঁঠা খেয়ে ফেলেন শুধু চামড়াটা বাদ দিয়ে, আর মা-র যে বছরের মধ্যে কত ব্রত আর মাসের মধ্যে কত উপোশ, তার আর অন্ত নেই। সে-সব দেখে বাবা আবার বলতেন, 'এত জপ-তপ তো বিধবার করবার কথা, কিন্তু তুমি তার সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ—যা স্বাস্থ্য আমার! তা ভালো, সময় থাকতে ক'রে নাও।'

'সময় থাকতে'—এই কথাটা আমার কানে বাজে। বাবা কি বুঝেছিলেন মা-র আর বেশি সময় নেই; বুঝেছিলেন, তিনি তাঁর অর্ধাঙ্গিনীকে প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন? অথচ, সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, আমার জ্ঞানত মনে পড়ে না বাবাকে কখনো মা-র সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করতে দেখেছি। একটা কটু কথাও বলতে শুনিনি। বরং, মা-র প্রতি বিশেষ একটু স্নেহের ভাবই ছিলো তাঁর, যে-স্নেহ তাঁর সন্তানদের মধ্যে একজনকেও দেননি তিনি, পাছে তারা কোনো দুর্বল মুহূর্তে তাঁকে অমান্য ক'রে মাথার উপরে বজ্রপাত ডেকে আনে। সন্তানদের বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা ছিলো, কিন্তু স্ত্রীর বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন; সেইজন্য সেখানে একটু কোমল হ'তেও তাঁর আপত্তি হ'তো না। তাঁর রাজত্বের সবচেয়ে সুশীল প্রজা ছিলেন মা, অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিয়েছিলেন তাঁর অনুশাসন, ধ'রেই নিয়েছিলেন এই সংসারে (আর মা-র কাছে সেটাই ছিলো সারা জগৎ) তিনিই সর্বেসর্বা। তুচ্ছ কোনো অপরাধের জন্য ছেলেদের যখন গুনে-গুনে বেত মারতেন তিনি (বয়স অনুপাতে ছোটো আর বড়ো মাপের বেত ছিলো তাঁর, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে অস্ত্রগুলিও লম্বায় বাড়তো) আর মেয়ে দুটোকে হাঁটুর ফাঁকে পিষে রাখতেন ঘড়ি দেখে দশ মিনিট থেকে

আধ ঘণ্টা পর্যন্ত, তখনো মা কোনো প্রতিবাদ করতেন না, শুধু আমাদের অবমাননার ঘটনাস্থল ছেড়ে দূরে স'রে যেতেন। অতএব আর বিরোধ ঘটবে কী নিয়ে?

কিন্তু, বাবা যদি মা-র সঙ্গেও ঐ রকম কোনো কর্কশ ব্যবহার করতেন তাহ'লেই যেন সুখ হ'তো আমার, হৃদয়ের জ্বালা একটু জুড়োতো। আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না যে বাবা মা-কে যন্ত্রণা দেন; অনেক চেষ্টাতেও তার কোনো প্রমাণ পাইনি ব'লেই আমার বিশ্বাস লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে গেছে। কী রকম যন্ত্রণা দেন জানি না, ধারণা করতেও পারি না; কতদিন অর্ধেক রাত্রি জেগে থেকেছি অসম্ভব কথা ভেবে-ভেবে; বাবা আমার মা-কে নিয়ে যে-রাত্রির মধ্যে লুকিয়ে আছেন তার ভার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে আমার। তা যদি না-ই হবে, যদি কোনো গোপন কষ্ট না-ই থাকবে, তাহ'লে মা এমন ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছেন কেন দিন-দিন, মুখের চামড়া হলদে হ'য়ে গেছে কেন, কেন হাত দুটি এত পাৎলা যে রোদ্দুর যেন এ-পিঠ ও-পিঠ ফুঁড়ে বেরোয়? আর কেনই বা এত ব্রত, এত উপোশ, পুজোর ঘরে এতক্ষণ কাটানো—যদি-না তার মানে হয় অমনি ক'রেই বাবাকে কিছু দূরে রাখা, অমনি ক'রেই নিজেকে ঘিরে বেড়া তুলে দেয়া—বাবার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য?

সেই ছেলেবেলায়, নিজের কাছেও এ-সব কথা প্রকাশ করার ভাষা আমি শিখিনি, কিন্তু চিন্তাগুলি ঝিলিক দিয়েছে মনের মধ্যে। তারপর, ক্রমশ যখন ভাষা শিখলুম, ভাবনাগুলিও স্পষ্ট হ'য়ে এলো, তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো, দেহের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া বিষ একটা অংশে জ'মে উঠে অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি হ'লো যেন। কিন্তু এর পিছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে।

তিন

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হবার দু-দিন পরে আমি একটা শিরীষ-গাছে চড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে প'ড়ে গেলুম। এই আমার জীবনের প্রথম পতন নয়, কিন্তু সেবারে ডালটা বেশ উঁচু ছিলো, চোখে ঝাপসা দেখলুম কয়েক মিনিট, হলুদ-চুনের প্রলেপ সত্ত্বেও রাত্রে ব্যথায় ঘুমোতে পারলুম না। পরের দিন মধুগঞ্জ থেকে পাশ-করা ডাক্তার এসে বললেন বাঁ পায়ের কব্জির আর বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে হাড় ভেঙে গেছে; দুই অঙ্গে কাঠের ফ্রেম লাগিয়ে, আঁটো, মোটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে চ'লে গেলেন তিনি। আমাকে যেন পেরেক ঠুকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হ'লো।

যে-কদিন শরীরে খুব যন্ত্রণা ছিলো অন্য-কিছু ভাবতে পারিনি। কিন্তু তার উপশম হ'তেই মনে হ'লো, ঐ ব্যথাই ভালো ছিলো আমার। জলজ্যান্ত সুস্থ শরীরে শুয়ে থাকা—আর তাও কিনা ঘৃণিত ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে মহাদেবের মতো উদার ছুটির সময়ে! চুপ ক'রে শুয়ে থাকলে বেশ থাকি, কোনো কষ্ট আছে মনেই হয় না, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই শরীরটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে। দিনের মধ্যে দু-চারবার প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য উঠতে বা বসতে হয়—তাও দূরে যেতে পারি না, ঘরটাকে পরিষ্কার রাখতে গিয়ে মা-র খাটুনি দেখে আমি লজ্জায় ম'রে যেতে থাকি, তার উপর ঐটুকুতেই হাতে-পায়ে এমন শূল বেঁধে যে তার পরে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করার উৎসাহ থাকে না। তা তো হ'লো—কিন্তু আমি এখন করি কী? সময় কাটে কী ক'রে?

আর এমনি ক'রেই—জীবনে প্রথম বার—পড়ার দিকে আমার মন গেলো। বাড়িতে কতগুলো হিতবাদী আর বসুমতীর গ্রন্থাবলী ছিলো: বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, শরৎচন্দ্র, অনুরূপা আর নিরুপমা দেবী, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। আর ছিলো কালী সিঙ্গির মহাভারত, আর মোটা বাঁধানো ব্রহ্ম-সংগীত—কোদাল-কাটা হাতের লেখায় আমার বাবার নামাঙ্কিত। আর মা-কে বিয়েতে কে উপহার দিয়েছিলেন একখানা তুলোর প্যাডে বাঁধাই 'বৈষ্ণব গীতিকা'। এগুলোকে বহুদিন ধ'রে চোখে দেখেছি, কিন্তু ফিরে তাকাইনি—আজ ঐ জিরজিরে হলদে পাতাগুলোর মধ্যেই বন্দী দশার সান্ত্বনা খুঁজতে হ'লো। বিরুদ্ধ ভাব নিয়েই প্রথম ছুঁয়েছিলুম ওদের, একটু পরেই ছুঁড়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে, ওদের অপদার্থতা প্রমাণ করার জন্যই কোমর বেঁধে। কিন্তু কখন এক সময়—আমারই অজান্তে—বইগুলো আমাকে টেনে নিলো ওদের মধ্যে; আমার খিদে নেকড়ের মতো দৌড় দিলে পাতার পর পাতা পার হ'য়ে, পথে যা-কিছু পড়লো চেটে-পুটে শাবাড় ক'রে দিলে। ভাঙা হাত-পা নিয়ে বই পড়াও নির্বিঘ্ন হ'লো না, কিন্তু আস্তে-আস্তে—সব বিকল মানুষই যেমন করে—আমি কয়েকটা কায়দা আয়ত্ত ক'রে ফেললুম; বালিশে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায়, বুকে বালিশ চাপা দিয়ে উপুড় হ'য়ে, নয়তো বাঁ পাশ ফিরে কাৎ হ'য়ে আমি শিখে নিলুম যে বই পড়ার জন্য চোখ দুটোই যথেষ্ট, আর এক হাত দিয়েও বইটাকে আঁকড়ে ধরা যায়, পাতা ওল্টানো যায়। যে-দু'মাস শুয়ে ছিলুম, এই ক'রেই বেশির ভাগ সময় কাটলো। আর অবশ্য গৌরী এসেছে মাঝে-মাঝে।

গ্রামের পুরুৎ ঠাকুর শীতল ভটচাযের মেয়ে গৌরী। তার বয়স চোদ্দ, তার দেহ নধর, সন্ধেবেলায় দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা আর কালো তার গায়ের রং। চড়ুইপাখির মতো চঞ্চল দুটো চোখ। আর

সে যখন ছুটে চলে তার বুকের মধ্যেও ছুটো পাখি ডানা ঝাপটায়। মা-র সঙ্গে পুরুৎঠাকুরের সম্বন্ধ কিছু বেশি, প্রায় রোজই কিছু-না-কিছু খবর নিয়ে—বা বিনা কাজেই—গৌরী এক-আধবার আসে। কিন্তু আমি যখন গাছ থেকে প'ড়ে গেলুম, সেই যে সে ভয় পেয়ে পালালো, তার পরের দিনও বাড়ি ছেড়ে আর বেরোলো না। তার পরের দিন এসে আমার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা জবড়জং অবস্থা দেখে তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। গুনগুন ক'রে ছুঃখ জানালো আমার কাছে : তার জন্মেই তো হ'লো এটা, সে ঐ উঁচু ডালের মঞ্জরীটা না-চাইলে তো আমাকে আর গাছে চড়তে হ'তো না, নিচুতেও অনেক ভালো-ভালো ফুল ছিলো, যা আমি লাফ দিয়ে বা হাত বাড়িয়েই পেড়ে দিতে পারতুম—তার অমন ছুর্মতি কেন হ'লো কে জানে, নিশ্চয়ই শনির দৃষ্টি পড়েছিলো সেই সময়ে। এই পর্যন্ত শুনে আমি বললুম—'বোকার মতো কথা বোলো না, চুপ করো!'

কিন্তু, পুরুতের মেয়ে গৌরী, 'দোষ', 'দৃষ্টি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'স্বস্ত্যয়ন', এই সব কথা শুনে-শুনে বড়ো হয়েছে ; এই ছুর্ঘটনার কিছুটা দায়িত্ব সে নিজের উপরে না-নিয়েই পারলো না। আমি শরীর দিয়ে যে-কষ্ট পাচ্ছি, সেটাকে সে তার মনের মধ্যে নৈতিক অপরাধে পরিণত ক'রে নিলে, এবং তার মার্জনার জন্মেও নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে চিঁড়ের মোয়া, তিলের নাড়ু, নারকোলের তক্তি, কোনোদিন আঁচলে বেঁধে কচি শসা, তালশাঁস ; তারপর, যখন দিনগুলি বেশ গরম হ'য়ে উঠলো, কোঁচড় ভ'রে জামরুল, গোল-গোল ডাঁশা কালোজাম, ডুরে শাড়ির মতো রঙিন কামরাঙা। মেয়েলি খাওয়াও বাদ গেলো না ; তেঁতুলের আচার, মুন আর লঙ্কা দিয়ে মাখা কাঁচা আম, লঙ্কা আর গুড় দিয়ে মাখা শুকনো কুলের আচার।

কোনোদিন এত খাইনি আগে, খাওয়াতে আমার বেশিক্ষণ ধৈর্য থাকে না, কিন্তু গৌরী বলতো, 'খাও, খাও। বেশি ক'রে খেলেই তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।' যদি বলেছি 'এই তো একটু আগে ভাত খেলুম', কি কোনো কিছুর স্বাদুতা বিষয়ে সন্দেহ দেখিয়েছি, তাহ'লে বলেছে—'আচ্ছা, একটু চোখ বোজো তো। এবার হাঁ করো।' আর তার হাতের তাপে গরম-হ'য়ে-ওঠা খাবারটি যখন মুখের মধ্যে পড়েছে, তখন অবশ্য আমার জিভ থেকে সারা শরীরে সুখ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি।

আমাকে শুধু খাইয়েই তার তুষ্টি ছিল না, অন্য ভাবেও আমার কাতর অবস্থা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতো সে। ব'সে-ব'সে গ্রামের সব খবর বলতো—নবা ছুটিতে তেলিরবাগে তার মামাবাড়ি গেছে; সেদিন একটা নৌকো ডুবেছে লোহজঙ্গের কাছে; টেঁপি তার ছোটো ভাইকে ভুল ক'রে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দেয়ায় সকলেই খুব ভয় পেয়েছিলো, কিন্তু ছেলেটার কিছু হ'লো না-দেখে এখন ভাবছে ওষুধ-টাতেই ভেজাল ছিলো কিনা। তার বাবার দশ-দুয়োরি পেশার জন্য অনেক ঘরেরই খবর পৌঁছতো তার কানে, আর সেই খবরগুলোকে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে নাটকের ভঙ্গিতে বলতেও তার আলস্য ছিলো না। আর শুধু যে ঘরের কথাই বলতো তাও নয়: তার মুখে শুনতুম, মজুমদারদের খিড়কি-পুকুরের পাড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটো নতুন বৌয়ের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে, সেন-বাড়ির রাজহাঁসের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে দুদিন, মিনুর মা-র খোঁড়া কুকুরটা একটা বেড়াল-ছানাকে পুষ্যি নিয়েছে—দু-জনে ভাই-বোনের মতো খেলা করে কিন্তু ভাই-বোনের মতো মারামারি করে না। এমনি, আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট ব'সে-ব'সে গৌরী নানান কথা বলতো। আমি হয়তো তার আগে

মহাভারতের তিরিশ পৃষ্ঠা পড়েছি, কি 'রাজসিংহ' কি 'অরক্ষণীয়া', কিংবা পড়েছি শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধির বা কোনো-এক অস্পষ্ট, রহস্যময় 'তিনি'র বর্ণনা। সেই সব ছবি, দৃশ্য, ভাষা তখনো আমার কানে আর মনে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে, আর তারই উপর ঝ'রে পড়ছে গৌরীর কথাগুলো—একটা স্রোতের উপর ছোটো-ছোটো বৃষ্টির মতো। জলের মধ্যে জল যেমন মিশে যায়, তেমনি আমার পড়া-গল্পের মধ্যে গৌরীর খবরগুলো গ'লে গিয়েছে—আমি অনেক সময় মন দিয়ে শুনিওনি, হয়তো চোখ দিয়েই দেখেছি বেশি। কোনো-কোনোদিন মা এসেছেন, তাতে গৌরীর উৎসাহ আরো বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু কাছাকাছি বাবার সাড়া পেলেই সে চুপ ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছে। আমিও কোনো কথা বলিনি ; আমার বাবাকে সে ভয় না-পেলেই অবাক হতাম।

আমাদের কোঠাবাড়ি ছিলো না ; একখানা বড়ো, একখানা ছোটো টিনের ঘর, মাঝখানে উঠোন, উঠোনের ও-পাশে রান্নাঘর, গোয়াল-ঘর, ঢেঁকি-ঘর। ছোটো ঘরটা দুটো কামরায় ভাগ করা ; একদিকে থাকি আমি, আর-এক দিকে আমার ছোটো দু-ভাই। বিছানায় বন্দী হবার পর থেকে আমার নির্জনতায় বেশি ব্যাঘাত ঘটে না : ভাইয়েরা বাইরে-বাইরে ঘোরে, বোন দুটো গোরুকে খাওয়ায়, ঢেঁকিতে ধান কোটে, মা সংসারের কাজে উদয়াস্ত সময় পান না। সকালে একবার আসেন আমার কাছে, দু-বেলা খাবার নিয়ে আসেন, মাঝে-মাঝে বোনেদের পাঠিয়ে খবর নেন, আর নিজে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা তিনটে নাগাদ কাছে এসে বসেন খানিকক্ষণ। কোনো-কোনো-দিন গৌরীও থাকে সে-সময়ে ; মা-কে আর তাকে একসঙ্গে দেখে আমার মনে প'ড়ে যায় খুব ছেলেবেলার একটা কথা—যখন, লক্ষ্মী-

পুজোর সময়, শিউলি কুড়োতে বাইরে এসে আমি দেখেছিলুম একদিকে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে আর-একদিকে ভোরের আকাশ রঙিন। দু-জনকে একসঙ্গে দেখতে একটু অদ্ভুতরকম ভালো লাগতো আমার, আবার যেন কোথায় একটু কষ্ট হতো: কেমন যেন হিংসে হ'তো এ-কথা ভেবে যে মা অমন রোগা আর ফ্যাকাশে, আর গৌরী অমন স্বাস্থ্যে ভরপুর।

আমার ঘরের পাশ দিয়ে বাবার যাওয়া-আসার পথ, এক-আধবার দাওয়ায় পায়ের শব্দ পাই, আধ মিনিট দাঁড়িয়ে খোঁজ নিয়ে যান কেমন আছি। কখনো গৌরীকে দেখলে ইস্পাতের মতো গলায় বলেন, 'গৌরী, যাও তো, দুটো পান নিয়ে এসো ভিতর থেকে', নয়তো— 'ননীর মা-কে জিগেস ক'রে এসো শেলাইয়ের জন্য কত নম্বর সুতো চাই তাঁর।' গৌরীকে দেখলেই বাবার মুখ একটু অন্ধকার হয়—তাঁর কালো রং আর ঘন দাড়িও তা লুকোতে পারে না—কিছু-না-কিছু ফরমাশ ক'রে তিনি তাকে তুলে দেন সেখান থেকে, আর সেও অবশ্য পালাতে পেরেই বাঁচে। আর একটু পরে যখন তাঁর আদিষ্ট জিনিশটি অথবা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ননী কিংবা টুনি (আমার বোনেরা) এসে দাঁড়ায়—তখন বাবা বাইরের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকেন একটু, তারপর আমার দিকে আর না-তাকিয়ে হনহন ক'রে বেরিয়ে যান।

ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে দেরি হ'লো, দু-মাসেও উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য হ'লো না। ততদিনে মা-র ভাঁড়ারে বছরের প্রথম পাকা আম উঠেছে, কোকিলগুলোর চ্যাঁচামেচিতে তেমন পাগলামি আর নেই, আমি মহাভারতখানা শেষ ক'রে এনেছি। ভারি গরম হয়েছিলো সেদিন। এই রকম দুপুরগুলো গাছের ছায়ায় কাটিয়ে দিয়েছি আমি, দিঘির ধারে বাঁশঝাড়ের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, যদিও জায়গাটার

জাতিসাপের বাসা ব'লে বদনাম ছিলো। মনে-মনে ভেবেছি, হয়তো কোনোদিন একটা সাপ বেরিয়ে আসবে আমার হাতে মারা পড়ার জন্য, কিংবা ঘুম ভেঙে দেখবো একটা সুন্দর মোটা সাপ আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েছে, বা আমার মুখে ছায়া ফেলে মাথার উপর ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে—যেমন গল্প শুনেছি কৃষ্ণের একবার হয়েছিলো। সাপের স্বপ্নও দেখেছি মাঝে-মাঝে, কিন্তু বাঁশঝাড়ে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যায়নি কখনো।

গরমে ব্যাণ্ডেজ আরো অসহ্য, ভিতরে চুলকোয়, তার উপর টিনের চালার বিশ্রী তাপে কাদার মতো ঘামতে হয়। মানুষ দুঃখে পড়লেই দুঃখ থেকে রেহাই পাবার বিদ্যে শেখে; আমিও ততদিনে বুঝেছিলুম অন্য কিছুতে মন দিতে পারলেই উপস্থিতকে ভুলে থাকা যায়। আমার প্রিয় গ্রীষ্মাবাসটার কথাই ভাবছিলুম সেদিন, দিঘির জল, বাঁশগাছের ছায়া, মাঝে-মাঝে বাতাসের নিশ্বাস। এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়েছিলুম, ঘুমের মধ্যেই মনে হ'লো কে আমাকে স্পর্শ করলে। তাকিয়ে দেখি গৌরী আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে আমার কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিলে সে। আমার বড্ড তেষ্টা পাচ্ছিলো, তাকে জল দিতে বললুম।

'লেবুর শরবৎ ক'রে আনবো?'

'না। জল।'

'পাতিলেবুর রসে গরম কমে জানো তো। কী ঘেমেছো—ইশ!'

হঠাৎ কেমন রাগ হ'লো তার উপর। উঠে ব'সে বললুম, 'তর্ক কোরো না। জল দাও।'

জলের গ্লাশ নিয়ে যখন কাছে এলো একটা মিষ্টি-মিষ্টি পচা ফুলের মতো গন্ধ পেলুম।

'এসেন্স মেখেছো নাকি ?'

'এসেন্স কেন মাখবো।'

'তবে গন্ধ কিসের ?'

'আমি কী ক'রে বলবো।'

'তোমার গা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে, আর তুমি জানো না ?'

'ও। চুলে ফুলেল তেল মেখেছি। ভালো ?'

'বিশ্রী !'

'সেদিন বদগন্ধওলা কবরেজি তেল মেখেছিলুম বলে—'

'এটাও তা-ই। বিশ্রী।'

'কী-রকম গন্ধ তোমার ভালো লাগে ?'

'আমার ভালো লাগে বড়ো-বড়ো পুরোনো জালার ভিতরকার গন্ধ। আর খালপাড়ের ঝোপঝাড়ের গন্ধ। আর কেরোসিনের।'

'তাই ব'লে চুলে তো আর কেরোসিন তেল মাখা যায় না।' গৌরী হেসে উঠলো।

তার হাসি দেখে আরো রাগ হ'লো আমার, পায়ের ব্যথাটা নতুন ক'রে অনুভব করলাম। গোড়ালিতে চাপ সয় না তখনো, আমাকে বসতে হয় অনেকটা ভিখিরির ভঙ্গিতে, জখমি পা-টার হাঁটুতে ভর দিয়ে। বসার জন্যে ভালো ক'রে তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম, পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, তার টলটলে শরীর, টলটলে দিঘির মতো ঠাণ্ডা তার গায়ের রং। কিন্তু সে-মুহূর্তে তার চড়ুই-চোখ স্থির হ'য়েই ছিলো।

'নতুন শাড়ি পরেছো দেখছি।

'বাবা এনে দিয়েছেন চণ্ডীপুরের মেলা থেকে। তুমি ব'সে আছো কেন ?'

'থাকি না।'

'লাগে না পায়ে?'

'লাগুক।'

গৌরী আমার বালিশটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে, চাদরটা একটু টান ক'রে দিলে। 'শোও এবার। একটা গল্প বলি, শোনো। আর অত মেজাজ কোরো না।'

আমি শুয়েই পড়লাম, কিন্তু আমার কিছুই ভালো লাগছিলো না। গৌরীকে আমার ভালোই লাগে, গৌরী এলেও ভালো লাগে, কিন্তু সেদিন কী-রকম অসহ্য মনে হ'লো তাকে; সে যে কাছে আছে তাতেই যেন ফোড়ার মতো আমার সারা শরীর টনটন ক'রে উঠলো।

'জানো, চণ্ডীপুরের মেলায় বাবা একটা আশ্চর্য জিনিশ দেখে এলেন। এক বাজিকরের খেলা। প্রথমে সে একটা আস্ত শোলমাছ গিলে ফেললে, তারপর উগরে দিলে গলা থেকে, আর তারপর সেটাকে সক্কলের সামনে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে শূন্যে ছুঁড়ে দিতেই শূন্যি থেকে আস্ত একটা শোলমাছ পড়লো।'

'গৌরী, চুপ করো!'

'জ্যান্ত মাছ—খাবি খাচ্ছে। বাবা নিজ চক্ষে দেখেছেন। আর টুকরোগুলোকে কেউ কোথাও খুঁজে পেলো না। কী ক'রে করে!'

'গৌরী, তুমি বাড়ি যাও এখন!'

আমার গলার আওয়াজে গৌরী কি অবাক হয়েছিলো, না কি এইজন্যেই আশা ছিলো তার? সে আরো স'রে এসে আমার মুখের উপর নিচু হ'য়ে ভারি গলায় বললে, 'কী হয়েছে তোমার?'

আমি আমার ভালো হাতটা তুলে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর সেই হাতেই তাকে টেনে নিয়ে এলাম বুকের উপর। আমার এক হাতেই দশ হাতের বল এসেছে তখন, আমার মুখের উপর

অনুভব করলাম তার নিশ্বাস, আমার বুকের উপর তার বুক, আমার তাপের গায়ে তার গ'লে যাওয়ার মতো শীতলতা।

কতক্ষণ এ-ভাবে কাটলো জানি না, হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘর কেঁপে উঠলো।

—'বীরেশ্বর!'

আমি যে উঠতে পারি না, দাঁড়াতে পাবি না, ছুটতে পারি না, সেটাকে এত বড়ো দুর্ভাগ্য ব'লে আর কখনো মনে হয়নি। যদি কোনোরকমেও উপায় থাকতো তাহ'লে আমি আমার জীবন নিয়ে, স্বাধীনতা দিয়ে পাগলের মতো দৌড় দিতুম যে-দিকে চোখ যায়, সেই মুহূর্তেই আমার ভাগ্যের মীমাংসা হ'য়ে যেতো। কিন্তু আমাকে নিঃসাড়ে প'ড়ে থাকতে হ'লো, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে, তুলোর মধ্যে দাঁত বসিয়ে, খাটের তক্তাটাকে দুই হাতে আঁকড়ে, আর বাবার চামড়ার চাবুক শূন্যে শিস দিয়ে আগুনের মতো পিঠে পড়লো আমার—এক, দুই, তিনবার। বাবা একটু থামলেন, দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললেন—'বিজোড়ে শেষ করতে নেই।' ব'লে আর-একবার।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে মা আমার গায়ের উপর উপুড় হ'য়ে পড়লেন। কেঁদে ফেলে বললেন, 'হাত-পা ভেঙে প'ড়ে আছে ছেলেটা, তাকে তুমি এই করলে! তুমি কি একটা মানুষ!'

'শুয়ে-শুয়ে ঘি-দুধ খেয়ে বেশ তেল বেড়েছে দেখছি। এইটুকুতে ভালোই হবে' ব'লে বাবা—আমি মুখ তুলে চেয়েও দেখলুম—চাবুক দোলাতে-দোলাতে চ'লে গেলেন।

খুব যন্ত্রণা, ছেঁড়া ছালের মলম নিয়ে কবরেজ মশাইর আনাগোনা, মা-র নিঃশব্দ, শুশ্রূষাময় হাত দুটি। কিন্তু আমার কিছুতে মন ছিলো না। আমি শুধু একটা কথা ভাবছিলুম: কী ক'রে প্রতিশোধ নেয়া যায়।

দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো? নৌকোতে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে মারবো? না কি জমিদারের দরোয়ানকে সিদ্ধি খাইয়ে তার লম্বা ছোরাটা চেয়ে আনবো একদিন? কিন্তু বাবার যে আমার চেয়েও অনেক বেশি গায়ে জোর। আমাকে ধ'রে ফেলে আন্দামানে চালান দিয়ে দেবেন, আর তখন—আমারই স্বকর্মের শাস্তি পাচ্ছি ব'লে—তাঁকে আর ঘৃণা করতেও পারবো না। সেটা যে ভয়ানক ক্ষতি হবে।

না, মুখোমুখি এঁটে উঠতে পারবো না: কৌশল চাই। ধরা যাক যদি সাপুড়েদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি কিছুদিন? চাকরের মতো তাদের কাজ ক'রে দিলে তারা কি কিছু শেখাবে না? তারপর সুযোগ বুঝে একটা বিষওলা সাপ ঠিক পায়ের কাছে ফেলে দিলেই হ'লো। সাপের কামড়ে কত মারা যায়—কেউ কিছু বুঝবে না।

না কি কোনো তান্ত্রিকের চেলা হ'য়ে বেরিয়ে পড়বো মারণ উচাটন মন্ত্র শেখার জন্য? না কি ঢাকায় গিয়ে পালোয়ানি আখড়ায় ভর্তি হবো, তারপর আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি আর লোহার মতো পেশী নিয়ে চাবুক হাতে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলবো, 'আপনার দেনা শোধ করতে এলাম। আসুন।'

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, কোনোটাই যে পারি না! কবে সেরে উঠবো, তারপর আরো কতদিন লাগবে সাপ পুষতে, মন্ত্র শিখতে, পালোয়ান হ'তে! এখন আমি কী করি তবে? বিছানায় প'ড়ে-প'ড়ে দম আটকে ম'রে যাবো নাকি?

একদিন আমার স্কুলের খাতার শাদা পাতায় পেনসিল দিয়ে কয়েক পাতা লিখে ফেললাম। পিঠের তখনো এমন অবস্থা যে চিৎ হ'য়ে শুতে পারি না। গিরগিটির মতো উপুড় হ'য়ে থাকি, লেখার কাগজটাকে

চাপা দিতে গেলে বাঁ হাতে ঝনাৎ ক'রে ওঠে, কখনো একটু অসাবধান হ'লেই পায়ের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাই। কিন্তু এই কষ্টগুলো—আমার মনের মধ্যে যা চলছে, তার তুলনায় তুচ্ছ হ'য়ে গেছে তখন। দুটো কাল্পনিক নাম ভেবে নিয়েছি : একজন পাশবিক বাবা, আর তার অপাপবিদ্ধ পুত্র। একজন নায়িকাও ছিলো, তার বেশি পার্ট ছিলো না, কিন্তু চুল ছিলো 'আগুল্‌ফলম্বিত।' লেখাটার শেষে পুত্রের মৃত্যু হ'লো, অনুতপ্ত পিতা তার চিতার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর লেখক যেন আরোগ্যলাভ ক'রে উঠে বসলেন। আমার প্রথম গল্প এইভাবে লিখেছিলাম।

চার

অবশ্য আমি তখনো কল্পনাও করিনি যে আমি 'লেখক' হবো। পিঠের ঘা শুকোবার সঙ্গে-সঙ্গেই পেনসিলে লেখা খাতাটাকে ভুলে গিয়েছিলাম, আর ততদিনে নিয়মিত মৃদু ব্যায়ামের সাহায্যে জোড়া-লাগা হাত-পা দুটোকে সচল ক'রে তুলতেই বেশি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। যতদিন না আরো তিন বছর কেটে গেছে, কিছু 'লেখা'র কথা আর মনেই হয়নি আমার। তখন আমি রিপন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি; একটা মাসিকপত্রে গল্প-প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন দেখলাম। নগদ টাকা পুরস্কার দেবে। আমার টাকার প্রয়োজন ছিলো; বাবা এমন টায়ে-টুয়ে টাকা পাঠাতেন যে শহরের সুখের দিকে তাকিয়ে দেখারও সাধ্য হ'তো না; বড়ো জোর সন্ধের পর দুরুদুরু বুকে একবার ঘুরে আসতুম বৌবাজারের সেই সব গলির মধ্য দিয়ে, যেখানে আধো-ছায়ায় নহ-মাতা-নহ-কন্যা-নহ-বধূরা সারি-সারি দাঁড়িয়ে থাকে। কলেজ কামাই ক'রে, হস্টেলের নিরিবিলি দুপুরবেলায়, তারপর অর্ধেক রাত জেগে একটা গল্প শেষ ক'রে পরের দিনই হেঁটে-হেঁটে সেই পত্রিকার আপিশ খুঁজে দিয়ে এলুম। লেখকের নামে আমার পদবীটা বদলে দিলুম—যাতে বাবার কখনো চোখে পড়লেও বুঝতে না পারেন, কিংবা যাতে এই একটা জায়গায় বাবার পুত্র ব'লেই পরিচিত হ'তে না হয় আমাকে। ঐ 'দেবযানী' গল্প লিখে বীরেশ্বর গুপ্ত প্রথম 'বিখ্যাত' হন, এই কথাটা বাংলা অভিধানেও পাওয়া যায় আজকাল।

আমি পেয়েছিলুম দ্বিতীয় পুরস্কার, চল্লিশ টাকা—পঁচিশ বছর

আগে, কুড়ি বছরের যুবকের পক্ষে, অনেক টাকা সেটা। দু-জন বন্ধু নিয়ে রাতের মতো একটা রাত ক'রে তোলা গেলো। শেষের দিকটা তেমন উপভোগ্য হয়নি, অনভ্যস্ত হুইস্কিতে বমি ক'রে দিয়েছিলাম, অভ্যস্ত মেয়েগুলো ধরাধরি ক'রে শুইয়ে দিলে আমাকে, তারপর আর মনে নেই। সেই ঘরেই ধূসর ভোরে তীব্র মাথা-ধরা নিয়ে জেগে উঠলাম : বেরোবার আগে পকেটের শেষ ক-টা টাকা আসলে-অব্যবহৃত মেয়েটার হাতে দিতে সে বললে, 'আবার এসো।' বেরিয়ে এসে মনে হ'লো এতদিনে বাবার সমকক্ষ হয়েছি, এমনকি তাঁর চেয়েও উন্নত মানুষ।

আমি আশাও করিনি বাবা আমাকে কলেজে পড়াবেন, আর তাও কলকাতায়। কিন্তু দৈবাৎ আমি ফার্স্ট ডিভিজনে গিয়েছিলুম, হেডমাস্টারের সুপারিশ ছিলো, আর আমাকে শিক্ষার যোগ্য জেনেও তা থেকে বঞ্চিত করবেন তেমন বিবেকহীন মানুষ অবশ্য বাবা নন। কিন্তু ঘরের কাছে ঢাকায় কলেজ থাকতে কলকাতায় কেন? তার কারণ ঢাকা মাত্র ছ-ঘণ্টার পথ, আর কলকাতা আঠারো ঘণ্টার—বড়ো ছুটি ছাড়া বাড়ি আসতে পারবো না। বাবা আমাকে দূরে-দূরে রাখতে চান, গৌরীর সান্নিধ্য থেকে দূরে, হয়তো তাঁরও উপস্থিতি থেকে দূরে। শেষোক্ত প্রস্তাবে তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত ছিলুম, খুব খুশি মনেই নৌকোয় চড়েছিলুম লোহজঙের ঘাটে গোয়ালন্দের স্টিমার ধরতে।

নদীর ঘাট অবধি মা এসেছিলেন সঙ্গে। অনেকদিন পর খোলা মাঠের মধ্যে মস্ত আকাশের তলায় তাঁকে দেখলাম। ঘরের মধ্যে ঠিক বোঝা যায় না; বাইরে রোদ্দুরে দেখে মনে হ'লো মা হঠাৎ একটু মোটা হয়েছেন, কিন্তু আরো, আরো ফ্যাকাশে। আকাশের তলায় ছোট্ট

এইটুকু মনে হয়, গায়ের রং বা রঙের অভাবে কাগজে তৈরি ফাঁপা কোনো পুতুলের মতো। তাঁর মৃদু গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছিলো আমার, আর তাঁরও কষ্ট হচ্ছে বুঝে আমি কয়েকবার তাঁকে ফিরে যেতে বললুম। কিছু না-ব'লে ঘাট পর্যন্ত এলেন। দু-একবার গৌরীকে আমার মনে পড়লো; সেই মধুর, গরম, পাশবিক দিন—যার স্মৃতি নির্বোধ শরীরটা ভুলে গেলেও মনেব মধ্যে তখনো দগদগ করছে—সেই দিনের পর তাকে আব দেখিনি, তাকে বাড়ি থেকেই আর বেরোতে দেন না তার মা—তবু একদিন হঠাৎ দেখে ফেলেছিলুম খালের জলে বাসন ধুচ্ছে। সে আমাকে দেখেছিলো কিনা জানি না, কিন্তু পিছন থেকে তাকে দেখে, নির্ভুল চিনতে পেরেও, তাকে হঠাৎ অন্য মানুষ মনে হয়েছিলো আমার, একেবারে অচেনা কোনো অন্য মানুষ।

নৌকো ছেড়ে দিলে, মা দাঁড়িয়ে রইলেন ঘাটে, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম। খানিক পরে তাকিয়ে—যদিও সামনে ধু-ধু মাঠ ছাড়া কিছু নেই—তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গেলেন? বোধহয় দুপুরের রোদে ধাঁধা লেগেছিলো আমার চোখে, কিন্তু আমি যেন মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক একটা কষ্ট অনুভব করলাম, মনে হ'লো তাঁকে আর কখনোই দেখবো না। কয়েকদিন আগে শোনা একটা কথা আমার মনে প'ড়ে গেলো। আমার শোনবার কথা নয়, দৈবাৎ শুনে ফেলেছিলুম। রাত্রে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর মা রান্নাঘর সাফ ক'রে রাখছেন, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার ধারে। যেতে-যেতে মা-র গলার আওয়াজ আমার কানে এলো। 'আর কেন? তোমার হাতে মার খাবার জন্যে আর কত জন্মাবে ওরা?'

পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে, উঠোনে দাঁড়ানো মাত্র, প্রথমেই বাবার সঙ্গে দেখা। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, চোখ দুটো লাল। বললেন, 'এসো। আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলাম। জুতোটা আর গায়ের জামাটা খুলে ফেলো।' শুনলাম, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে মা মারা গেছেন। অকালে একটা শিশুও জন্মেছিলো, সেও বাঁচেনি। ক-দিন পরে আর-একটা খবর পেলাম : শ্রাবণ মাসেই গৌরীর বিয়ে হ'য়ে গেছে।

এর পরে ছুটিতে বাড়ি আসার উৎসাহ অনেক ক'মে গেলো আমার। নেহাৎই হস্টেল বন্ধ থাকে ব'লে, কিংবা খোলা থাকলেও বাবা টাকা পাঠাবেন না ব'লে যেতে হয়। বি. এ. ক্লাশে ওঠার পর থেকে আরো অসহ্য মনে হ'লো বাড়ি আসা, কেননা ততদিনে আমার কলকাতার আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে, গল্প লিখে কিছু রোজগারও করছি, কিংবা রোজগারের জন্যই লিখছি মাঝে-মাঝে। আমার ভারি অবাক লাগে বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে, যাঁদের টাকার দরকার ছিলো না, আর তবু যাঁরা বই লিখেছেন।

ফোর্থ ইয়ারে ওঠার আগেকার গ্রীষ্মের ছুটিতে গৌরীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হ'লো। সে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসেনি, বিধবা হ'য়ে এসেছে। আমি কলকাতায় থাকি, কলেজে পড়ি, দেখতেও মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছি ; আর গৌরী তো আরো বেশি বদলে গেছে ; বোধহয় এ-সব কারণেই দেখা হবার বাধা হ'লো না। তার মা-ই একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন—কাছে বসিয়ে অনেক কথা বললেন, আমার মা-র কথা, মাতৃহীন হবার দুঃখের কথা—অবশ্য মা-বাবা তো কারোরই চিরকাল থাকে না, কিন্তু ঐ হতভাগিনী মেয়েটার জীবন এখন কাটে কী ক'রে—একটা সন্তান পর্যন্ত নেই। 'বোঝো তো বাবা, আমাদের

সব ঘরে মেয়েকে তো আর বেশি বড়ো করা যায় না, আর পুরুষমানুষে কোনো দোষই বর্তায় না, কিন্তু মেয়েদের পান থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ। তা পাত্র ভালোই ছিলো, কিন্তু টিঁকলো না—কপাল। তোমার বাবা বলেন, "তাতে কী হয়েছে—আবার বিয়ে দিন মেয়ের", কিন্তু ও-সব খেরিস্তানি কাণ্ড ক'রে কি আর গ্রামে বসবাস চলে—আর ওঁদের হ'লো তিন পুরুষের যজমানি ব্যবসা। আর তাছাড়া কথা হ'লো যেখানে কুমারী মেয়েগুলোই ঘরে-ঘরে ধিঙ্গি হচ্ছে সেখানে বিধবাকে কে বিয়ে করবে, বলো!'

কথা শেষ ক'রে তিনি নিঃশব্দে একটু কাঁদলেন। তাঁর চোখের জলে মনস্তাপ ছিলো—কিছুদিন সবুর ক'রে আমার সঙ্গেই তাঁরা গৌরীর বিয়ে দেননি ব'লে, আর ছিলো অতি সূক্ষ্ম, প্রায় নিজের কাছেও অব্যক্ত এই অসম্ভব ইচ্ছা যদি এখনো, কোনোরকমে, সেটা ঘ'টে যায়। এখন সবই জলের মতো বুঝতে পারি, কিন্তু তখন কিছু বুঝিনি। বুঝিনি, ভদ্রমহিলার কথা তেমন মন দিয়ে শুনিনি ব'লে, বিয়ে করার কল্পনাও তখন আমার ছিলো না ব'লে, আর—এই কারণটাই সবচেয়ে বড়ো—গৌরীকে দেখে আমার দেহে-মনে কোনো সাড়া জাগেনি ব'লে। তার মা তাকে চুল কেটে ফেলতে দেননি, কিন্তু মোটা শাদা থানটাতেই তার সকল নারীত্ব যেন চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো আমার চোখে। ভীষণ বোকা ছিলাম, আর অবশ্য ছেলেমানুষও ছিলাম। মিথ্যে আমরা যৌবনের স্তব করি—পৃথিবীতে অনেকগুলো বছর না-কাটানো পর্যন্ত কেউ বোঝে না কাকে বলে রূপ, কাকে বলে নারীত্ব, কাকে বলে বাসনা।

গৌরী আমার সঙ্গে দাওয়ায় এলো। একটু দীর্ঘকাল ধ'রে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন আছো?'

'ভালো।' এটুকু ব'লেই থেমে গেলাম। 'আর তুমি?' এই কথাটা বেধে গেলো মুখে। তার জন্য করুণা হ'লো আমার, আর যাকে আমরা কামনা বলি, করুণার মতো শত্রু আর নেই তার। দু-একটা তুচ্ছ কথার বিনিময় ক'রে, তার প্রতি আমার উৎসাহের অভাবে লজ্জিত হ'য়ে চ'লে এলুম। তার সঙ্গে আবার দেখা করার মতো উদ্যম জোগালো না। একটু ব্যস্তও ছিলুম, সেই জ্যৈষ্ঠেই আমার দুই বোনের একই লগ্নে বিয়ে হ'য়ে গেলো। আমার পরের ভাই ঝুলনপুরের জমিদারি শেরেস্তায় চাকরি নিয়ে চ'লে গেলো, আমিও ছুটি ফুরোবার আগেই কলকাতায় ফিরলুম। বাবাকে বললুম, পরীক্ষার পড়ার জন্য পুজোর ছুটি আর বড়োদিনের ছুটি দুটোই কলকাতায় কাটাতে চাই। বাবা আপত্তি করলেন না। বরং, পুজোর মাসে বরাদ্দের বেশি টাকা পাঠালেন, নতুন কাপড় আর শীতের আলোয়ান কিনে নেবার জন্য। আমি তা দিয়ে পুরীর সমুদ্র দেখে এলাম।

বাবা আমাকে কচিৎ যা চিঠি লেখেন সবই পোস্টকার্ডে, কিন্তু ক্রিসমাসের ছুটির আগে একটা খামের চিঠি পেলাম তাঁর। সে-চিঠির সারাংশ এই যে সম্প্রতি তিনি পুনরায় বিবাহ করেছেন, এবং আমার 'মাতৃদেবী' আমাকে একবার দেখতে চান। অতএব আমি যেন আসন্ন ছুটিতে বাড়ি যাই।

এই খবরটি আমার মনে জোরালো কোনো আঁচড় কাটলো না। বিষাদ, খেদ, উত্তেজনা—কিছুই অনুভব করলুম না আমি, বরং চিঠিটা সরিয়ে রেখে কয়েকটা ক্যালকুলসের অঙ্ক ক'ষে ফেললুম। শুধু একটু অবাক লাগলো এ-কথা ভেবে যে আমার বাবার স্ত্রী আমাকে দেখতে চাইবেন কেন। আর-একটা প্রশ্ন হ'লো: বাবার এই আদেশ পালন করবো কিনা।

শেষ মুহূর্তে চ'লেই গেলুম। না-যাওয়া অসম্ভব ছিলো তা নয়, কিন্তু আমার বুদ্ধির চেয়েও গভীর কিছু, আমার রক্তের কোনো অজানা চাঞ্চল্য—তা-ই আমাকে টেনে নিয়ে গেলো। এই রকমই হয়েছে আমার বার-বার, যখনই কোনো বোঝাপড়ার সময় এসেছে আমি সেটাকে ফেলে রাখিনি, অচেতনভাবেই এগিয়ে গেছি তার দিকে ; যা হ'তেই হবে সেটাকে ঘটিয়ে দিতে দেরি করিনি।

বাড়ি এসে দেখি নতুন মানুষটি আর-কেউ নয় : গৌরী। ঘরে যাবার আগেই, উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখা হ'য়ে গেলো। বাবা বললেন, 'তোমার মা। প্রণাম করো।'

আমি শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'প্রণাম করো !'

আমি এক চুল নড়লাম না।

'বীরেশ্বর !'

অন্য এক দিনের প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। আমি চুপ।

বাবা কাছে এসে আমার চোখে চোখ রাখলেন। আমি সমানে-সমানে তাকিয়ে রইলাম তাঁর চোখে। প্রায় তাঁরই সমান লম্বা আমি তখন, চওড়া কাঁধ, ভাঙার পর থেকে বাঁ হাতটা কিছু দুর্বল হ'য়ে গেলেও ডান হাতটা নির্ভয়। কয়েক সেকেণ্ড চোখে-চোখে কাটলো।

বাবা স'রে গিয়ে বললেন, 'এঁকে যদি মা ব'লে মানতে না পারো তাহ'লে আর এ-বাড়িতে জায়গা হবে না তোমার। আমি এখন নবিগঞ্জে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমাকে যেন দেখতে না পাই।' খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'এই নাও তোমার ভাড়ার টাকা।' ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিলেন, শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে সেটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়লো। সেটা

কুড়িয়ে নিলে গৌরী। তারপর শান্তভাবে বললে, 'এসো। ঘরে এসো।' ঢাকাই শাড়ি তার পরনে, গলায় হার, চকচকে চুলের সিঁথিতে জবার মতো গাঢ় সিঁদুর। এই প্রথম আমি তার বিবাহিত চেহারা দেখলাম। দেখে আমার বুকের মধ্যে জ্বালা ক'রে উঠলো।

আমাকে স্তব্ধ দেখে আমার হাত ধ'রে বললে, 'চলো।'

কিসের জ্বালা? ঈর্ষার, ঈর্ষার। ঈর্ষা আমার বাবাকে, আমার মরা মায়ের পক্ষ নিয়ে ঈর্ষা। কখনো, কখনো তার আগে আমি বুঝিনি আমার মা-কে আমি কত ভালোবাসতাম। তাঁর প্রথম সন্তান আমি, সেই বাল্যবিবাহের যুগে তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের খুব বেশি তফাৎ ছিলো না; তাঁর তরুণ চেহারা, প্রায় কিশোরী চেহারা স্পষ্ট মনে পড়ে আমার, মনে পড়ে তাঁর গায়ের গন্ধ, স্নানের পরে পিঠ-ভরা চুল, আমি প্রথম-প্রথম পাঠশালায় যাবার আগে আমার কড়ে আঙুলে তাঁর ছোট্ট মিষ্টি কামড়ের রোমাঞ্চ। এই উঠোনে দাঁড়িয়েই, এই সেদিন, তাঁর মৃত্যুর খবর শুনেছিলাম। আর হঠাৎ আমার সেই ঈর্ষার আবেগ পরিণত হ'লো ভালোবাসায়, মা-র জন্যে যত ভালোবাসা গোপন হ'য়ে ছিলো আমার, সব যেন উদ্বেল হ'য়ে ছুটলো—গৌরীর দিকে। আমার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী আর রইলো না সে: বাবার মুখে ঐ 'মা' শব্দটা শোনা মাত্র যেমন আমার মা-কে আমার মনে প'ড়ে গেলো, তেমনি—সেই একই ঝোঁকে—আমার চোখে অপরিসীম-রূপে কাম্য হ'য়ে উঠলো গৌরী। মনে হ'লো চ'লে যাই—এই মুহূর্তে এ-দেশ ছেড়ে চিরকালের মতো চ'লে যাই।

কিন্তু বাবার আচরণের এই অর্থ আমি কখনোই করবো না যে আমাকে তাড়াবার জন্য তিনি এই কৌশল করেছিলেন। কেননা—তিনিও জানতেন আর আমিও জানতাম—আমাকে 'তাড়াবার' কোনো

কথাই ওঠে না আর, আমি নিজেই তাঁর ডাল থেকে শিথিল হ'য়ে গিয়েছি—পাখি ডানা পেয়েছে, আকাশ পেয়েছে। তাছাড়া, তাঁর এই বহুকালের পরিকল্পনা পরিপূরণের জন্য দৈব যখন দু-দুটো মৃত্যু ঘটিয়ে দিলে, তখন যে-রকম সক্ষম আর নির্মলভাবে বাকি ব্যবস্থাটুকু তিনি ক'রে উঠলেন—দুই মেয়ের বিয়ে দিতে-দিতেই এক ছেলের চাকরি জুটিয়ে দিলেন—তা থেকেই বোঝা যায় আমাকে 'তাড়াতে' হ'লে মুখের উপরেই বলতেন সে-কথা, সোজা তীরের মতো বলতেন, 'আর তোমাকে টানতে পারবো না আমি। এবার নিজের পথ ছাখো।' বাবার সাহস, দম্ভ, আত্মবিশ্বাস যে কতখানি—আমি এতদিন ধ'রে যা জেনেছি তার চেয়েও যে অনেক বেশি—সেই রাত্রির ঘটনা থেকেই তা বুঝেছিলাম। ঠিক সেদিন নবিগঞ্জে না-গেলেই কি চলতো না তাঁর? রাত্রে কি ফিরতে পারতেন না ইচ্ছে করলে? ঠিক তখনই চ'লে গেলেন—সে কি সচেতনভাবে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য, না কি আমাকে প্রতিযোগিতার যোগ্য ব'লেই ভাবেননি তিনি? এই কথাটার ঠিক উত্তর আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আমাকে অপমান করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন? আমি কত বোকা, কত অপদার্থ, তা-ই আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য? না কি তাঁর নিজের মনেই ছোট্ট অপরাধবোধ ছিলো, তারই প্রক্ষালনের জন্য সেই রাতটা বাইরে কাটাতে হ'লো তাঁকে? অন্তত, তাঁর মতো বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর নিজের নববধূর মন তো বুঝেছিলেন।

বুঝেছিলেন বইকি। বুঝেছিলেন ব'লেই ডেকে পাঠালেন আমাকে, বুঝেছিলেন ব'লেই তক্ষুনি তাঁর নবিগঞ্জে যাবার দরকার হ'লো। তা না-হ'লে যে আমার উপর তাঁর শ্রেষ্ঠতার শেষ ঘোষণা হ'তো না। যা ছিলো আমার মনে অচেতন, তিনি সজ্ঞানে চাইলেন সেই বোঝাপড়া—

শুধু চাইলেন না, বলপ্রয়োগ করলেন তার জন্য, এবার শুধু পেশীর বল নয়, স্নায়ুর শক্তি, মনের শক্তি। নিজেরই দর্পের নিশেন ওড়াবার জন্য স'রে যেতে হ'লো তাঁকে—আমাকে আগুনের মুখে রেখে যেতে হ'লো। তাঁর নিশেন লুটিয়ে পড়লো—তিনি তা জানলেন না। কিন্তু তার মানে কি এই নয় যে আমিই প্রচণ্ডভাবে হেরে গেলাম তাঁর কাছে?

এই কথাটা ভাবতে এখনো খারাপ লাগে। ভাবতে খারাপ লাগে সে-রাতে গৌরী আর আমি যে-তীব্র মদ ছেঁকে তুলেছিলাম তার মধ্যে একটুখানি প্রতিশোধের গাদ ছিলো।

আমার এখন যে-বয়স, বাবার তখন ঠিক তা-ই। কিন্তু কোনো তুলনা হয় না তাঁর সঙ্গে আমার। তিনি ছিলেন ঋজু আর দৃঢ় আর বলিষ্ঠ, মাটিতে পা রেখে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াতেন, ছোরার মতো চোখ, গোঁফদাড়ির ফাঁকে তীক্ষ্ণ, শাদা দাঁত। খেত কুপিয়ে, ধান কেটে, গঞ্জে-গঞ্জে আম ধান শর্ষে তিলের বেচাকেনা ক'রে, রোদ বৃষ্টি বাতাসের ঝাপট লেগে-লেগে, আঙুলের ডগাটুকু পর্যন্ত ক্ষমতায় ভরপুর ছিলো শরীর। আমারও স্বাস্থ্য ছিলো, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিলো অস্বাস্থ্যের প্রতি আকর্ষণ। হ্যাঁ—অস্বাস্থ্য বইকি, কয়েক পাতা কাগজ লিখে যার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা মিটে যায়, কাম চরিতার্থ হয়, সে রুগ্ন নয় তো রুগ্ন কে? মদে, অত্যাচারে, রাত্রি-জাগরণে আর এই নিশ্চল, উপবিষ্ট, আত্মভুক বই-লেখার পেশায়—সেই স্বাস্থ্য মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে চুরমার ক'রে ভেঙে দিয়েছি আমি। পিঠ কুঁজো হ'য়ে গেছে, রাত্রে ঘুমোতে পারি না, কোথাও একটা আওয়াজ হ'লে চমকে কেঁপে উঠি। শেষ পর্যন্ত এই 'আরোগ্য-নিকেতনে'! কিন্তু এ যে হ'তেই হবে, নিজেকে যে-কোনো উপায়ে ধ্বংস করতে হ'তোই আমাকে—যদি আমি ধ্বংস না-হতুম তবে আমি কিছুই হতুম না।

এই কথাটাই বোঝে না লোকেরা। বোঝে না, ছায়া বাদ দিয়ে আলো-কে পাওয়া যায় না, পদ্মকে ভালোবাসলে পাঁকটাকে মেনে নেয়া চাই। বোঝে না, ইওরোপের হিংস্রতা বাদ দিলে ইওরোপের সভ্যতাও ম'রে যাবে। মিতালি! প্রগতি! বিশ্ব-শান্তি! হো-হো ক'রে হেসে উঠতে হয় এ-সব শুনে। বাঘটা গোরু হ'য়ে যাবে, আর গোরুগুলো সিনথ্রি ল্যাবরেটরিতে তৈরি বৈজ্ঞানিক ঘাস খেয়ে-খেয়ে জোয়ান হ'য়ে উঠবে?—বিরোধ! বিরোধ! বিরোধের উপর এই সৃষ্টি টি'কে আছে—বিষ্ণু আর শিবের বিরোধ, সতী আর বেশ্যার বিরোধ, এমনকি এই একই দেহের মধ্যে প্রাণ আর মনের বিরোধ। বিরোধ বাদ দিলে চলে না, কোনোটাই বাদ দিলে চলে না। যারা বলে, বীরেশ্বর গুপ্ত 'ভালোভাবে' জীবন কাটালে কত ভালোই না হ'তো, তাদের আমি এই কথা বলতে চাই: বীরেশ্বর গুপ্ত এমনি ক'রেই হয়েছে, শুধু এমনি ক'রেই হ'তে পারতো, ঠিক এই রকম ক'রে না-হ'লে—আবার বলি—বীরেশ্বর চাটুয্যে নামক একজন ভদ্রলোক সম্ভব হ'তে পারতো, কিন্তু বীরেশ্বর গুপ্ত কখনোই নয়।

এই সব পুরোনো কথা আমার এত মনে আছে তা আমি নিজেই জানতুম না। এখানে আসার পর—বোধহয় আর-কিছু ভাবার নেই ব'লে—আস্তে-আস্তে সব মনে পড়ছে। হয়তো ঐ পুকুরটাও এর জন্যে দায়ী। এই হাসপাতালের সবচেয়ে ভালো জিনিশ ওটা; এই পুরোনো পুকুর—ডোবা বললেও ভুল হয় না—যেটা সারাদিন আমারই মতো বেকার হ'য়ে প'ড়ে থাকে—ঠিক হাসপাতালেরও নয়, কিন্তু কাছেই—আমার জানলা দিয়ে দিনের বেলা চোখে পড়ে। সকালে বিকেলে তার রঙের বদল লক্ষ্য করি, লক্ষ্য করি হাওয়ায় তার শিরশিরানি। কলকাতার লেকটাকে আমি বরাবর ঘেন্না করেছি—মরা জল, কোনো কথা বলে না।

কিন্তু এই পুকুরটার কথা আলাদা। ভাঙা ঘাটের ধাপ দেখা যায়, একটা শীর্ণ গাছ এখনো একটু ছায়া দেয় সেখানে, জলের মধ্যে কচুরিপানা সাপের মতো ফণা তোলে। এখন আর কেউ নাইতে নামে না—কিন্তু এককালে অনেক বউ কোন না ডুবে মরেছে।

আজ রাত্রিটা খুব অন্ধকার হয়েছে; এই অন্ধকার আর জোনাকির ভিড় দেখে মনে করা শক্ত যে কলকাতা থেকে, আমার এখনকার 'জীবন' থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে আছি। যে-কোনো জায়গাই হ'তে পারতো, আমার বাবার সেই টিনের ঘরও হবার বাধা ছিলো না। সে-রাতটাও এই রকমই অন্ধকার ছিলো। আর ছিলো শীত। ব'সে-ব'সে গৌরীর মুখে তার দ্বিতীয় বিয়ের গল্প শুনছি। তার বাবা, শীতল ভটচায, প্রস্তাব শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দু বিধবার বিয়ে! চাটুয্যে মশাইর মাথা-খারাপ হ'লো নাকি? কিন্তু বাবা বললেন, 'আপনারা কেউ বিদ্যাসাগরের চাইতে বড়ো পণ্ডিত নন। আপনার মেয়ে আজ কুমারী থাকলে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতেন কিনা তা-ই বলুন!' উত্তরে পুরুৎঠাকুরকে মানতেই হ'লো যে তাঁর মেয়ের জন্য অত বড়ো ভাগ্য তাঁর স্বপ্নের অতীত, কিন্তু বিধবা মেয়ের বিয়ে দিলে কি আর ভিটেমাটি টিঁকবে? 'কিছু ভাববেন না। আমি আছি।' তাঁর চেহারা দেখে বামুনঠাকুর আর তর্ক করতে পারলেন না, কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে এলেন। খবর শুনে গৌরীর মা বললেন, 'হরি, হরি!' তারপর গৌরীকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললেন। একই সঙ্গে সুখের আর দুঃখের সেই কান্না।

সারা গ্রাম খেপে গেলো, জমিদার-মশাই ঘরে ব'সে হুংকার ছাড়লেন, কিন্তু কার এত সাহস যে মহেশ্বর চাটুয্যের মুখের উপর কোনো কথা বলবে। তাঁর সঙ্গে বামুন-কায়েৎ কেউ কথা বলে না, তাঁকে এড়িয়ে

চলে, দূরে দেখলে সম্ভাষণ করার ভয়ে অন্য পথ নেয়। কী-বা তাঁর এসে যায় তাতে—তাঁর জীবন একই ভাবে চলছে, মণ্ডল আর ভুঁই-মালিদের সঙ্গে খেতে কাজ ক'রে, হাটে-বাটে মহাজনের গদিতে ঘুরে-ঘুরে। অনেক রকম ভয়ের কথা তাঁর কানে এলো—ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবে, লেঠেল দিয়ে মাথা ফাটাবে—তিনি নির্বিকার। শেষ পর্যন্ত মুশকিল হ'লো বিধবার বিয়েতে মন্ত্র পড়তে কোনো পুরুৎ রাজি হয় না। দশ গ্রাম দূর থেকে এক বামুনকে যমের ভয় দেখিয়ে প্রায় চ্যাং-দোলা করে ধ'রে নিয়ে এলেন মহেশ্বর চাটুয্যে। বিয়ের সময় কনেরাই সাধারণত কাঁপে, কিন্তু সে-বিয়েতে বর-কনে দু-জনেই স্থির ছিলো—কিছু কেঁপেছিলেন মেয়ের বাপ, আর পুরুৎঠাকুরটি বলির পাঁঠার মতো। 'সেই বামুন বেচারার কী দশা হয়েছে জানি না, কিন্তু বাবার সব বাঁধা ঘর থেকেও আজকাল আর ডাকে না তাঁকে, আর তোমার বাবাও হাতে একটা লাঠি নিয়ে বেরোচ্ছেন।'

সব শুনে আমি বললাম, 'কিন্তু তোমার কী মনে হ'লো?'

'বিয়ের কথায়? আমার আবার কী মনে হবে।'

'ভালো-মন্দ কিছুই মনে হ'লো না?'

'ভালোই মনে হ'লো। বিধবার জীবন তো সুখের নয়, সত্যি।'

'শুধু এই?'

'আর তোমার বাবার বৌ হবার সম্মান!'

'শুধু সম্মান?'

'না। কত বড়ো সুখ! তোমাকে দেখবো। তোমাকে কাছে পাবো।'

এ-কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। বাবার ঘরের দাওয়ায় ব'সে ছিলাম আমরা, তার অর্ধেকটায় বাঁশের বেড়া দিয়ে একটা

তক্তা পাতা, অর্ধেকটা খোলা। সেই তক্তায় একটা কম্বল পেতে নিয়েছে গৌরী। ঘরের চৌকাঠের কাছে খুব কমানো একটা লণ্ঠন জ্বলছে, বাইরে থমথমে অন্ধকার। নিশুতি রাত—অন্তত মনে হচ্ছে তা-ই, গ্রামে তো সন্ধের পরে রাত্রি আর নড়ে না। আমার ছোটো ভাই খাওয়ার পরে অন্য ঘরটায় শুতে চ'লে গেছে, তার পাশের কামরায় —সেই যেখানে আগে থাকতুম—আমারও বিছানা তৈরি।—কিন্তু গৌরীর সঙ্গে বহুকাল পর দেখা হ'লো।

অন্ধকারে তার মুখ ভালো দেখতে পেলাম না, কিন্তু লণ্ঠনের অতি ক্ষীণ আলোয় তার চোখ হঠাৎ জ্ব'লে উঠলো—যেমন পশুর চোখে সবুজ আভা ঝলক দেয়।

বললে, 'তোমার শীত করছে।'

'না।'

'তোমার গায়ের আলোয়ান ছেঁড়া কেন?'

'ছিঁড়ে যায় ব'লে।'

'নতুন নেই?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'সত্যি কথা বলো!'

'না, নেই।'

'বাবা কিনে দেননি?'

'টাকা পাঠিয়েছিলেন, আমি খরচ ক'রে ফেলেছি। আমার শীত লাগে না।'

'দেখি তোমার হাত।'

আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম।

'ঠাণ্ডা হাত তোমার। চলো ঘরে যাই। আমারও শীত করছে।'

ঘরে এসে দোরের শিকল তুলে দিলে। 'বোসো। পা তুলে বোসো। এই নাও।' আমার হাঁটুর উপর লেপ ছড়িয়ে, নিজেও তার তলায় পা ঢুকিয়ে, মুখোমুখি বসলো। 'বলো এবার। তোমার খবর বলো, শুনি।'

আমি কথা বললাম না। তার আহ্বান অনেক আগেই বুঝেছি আমি; জেনেছি, এরই মধ্যে তার দাঁত ব'সে গেছে আমার ঘাড়ে। আমার প্রতিটি রক্তকণিকা জেগে উঠেছে তখন, কিন্তু আমার মন পাগলের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছে। কী করি আমি এখন? যদি তা-ই হয়, তা-ই হ'য়ে যায়, তাহ'লে তো বাঁধা প'ড়ে যাবো আমি; অবিরল, অবিরল, কামনা করবো ওকে; অথচ আজকের এই রাত্রের পর ওকে আর চোখে দেখবো কিনা তাও জানি না। কিন্তু সেটাই কি সবচেয়ে বড়ো কারণ নয় যার জন্য আমার এখন অন্য পথ নেই আর? আর কখনো হবে না ব'লেই তো আজকের মুহূর্তটা এত মূল্যবান, এত ঐশ্বর্যময়, এমন অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কিসের সম্ভাবনা? দেহের তৃষ্ণা, হৃদয়ের জ্বালা, মরুভূমির নিশ্বাস। একজনের অভাবে পৃথিবী শূন্য হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। এখনই, এখনই আমি অনুভব করতে পারছি কাল আমার চ'লে যাওয়ার কষ্ট, ওকে ছেড়ে চ'লে যাওয়ার যন্ত্রণা।—কিন্তু কষ্টকে এত ভয় তোমার? স্বর্গ হাতে পেয়ে হারাবার ভয়ে নেবে না এত কাপুরুষ তুমি? নেবে, হারাবে, জ্বলবে, স্পন্দিত হবে—এ-ই নিয়েই তো জীবন।

তার কথা কানে এলো।—'মাঝে অনেকদিন বাড়ি আসোনি?'

'তোমার বিয়ের খবর পেলে আসতাম বইকি।'

ঠাট্টা করো কেন। তুমি তো আর বিয়ে করলে না আমাকে। তোমাকে দোষ দিই না তার জন্য। অমন কত হয় ছেলেবেলায়—কে-ই বা মনে রাখে।'

'তুমি রেখেছিলে?'

অন্য কী-একটা বলতে গিয়ে গৌরী কথাটা বদলে নিলে।

'সে-কথাই বলছি। আমার অবশ্য হাত ছিলো না তখন। মা-বাবা বিয়ে দিলেন ; হ'য়ে গেলো।'

'আর এবার?'

'সে তো আগেই বলেছি।'

' "না" বললে না কেন?'

' "না" কেন বলবো। সবই তো অনিশ্চিত—আজকের এই সময়টুকু ছাড়া। তুমি কি সত্যি কালই চ'লে যাবে?'

'কালই যাবো।'

'থাকো না।'

'থাকলেই কি আর তুমি আসতে পারবে আমার কাছে?'

গৌরী নিচু গলায় হেসে উঠলো। 'এখনো বাবাকে তোমার এত ভয়?'

'ভয় তো এখন তোমারই বেশি, গৌরী। ধরো এখন, এই মুহূর্তে তিনি যদি এসে পড়েন?'

তার কাঁধ দুটো ন'ড়ে উঠলো একবার, বিছানার উপর দিয়ে পিছলে স'রে এলো আমার পাশে। 'বলো কী! অমন দৈত্যের মতো মানুষটাকে ভয় করবো না! এই তো—' আমার জামার তলায় পিঠের উপর হাত চালিয়ে দিলে, খুঁজে-খুঁজে একটা জায়গায় আস্তে আঙুল ছোঁয়ালো। 'এই এখানে। চামড়াটা এখনো কুঁচকে আছে দেখছি।

তিনি ভুলতে পারেন, তুমিও ভুলে যেতে পারো। কিন্তু আমি তো ভুলিনি!'—বলতে-বলতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার মাথাটাকে নামিয়ে আনলে তার কোলের উপর—'ঠিক! এ-ই ঠিক আছে। আসুন তিনি এবার—এই মুহূর্তে আসুন না তিনি চাবুক হাতে নিয়ে—আর কি তিনি ছুঁতে পারলেন তোমাকে? না, না! আমি এমনি ক'রে তোমাকে ঢেকে রাখবো—এমনি ক'রে।—এমনি ক'রে! হ্যাঁ—আমার শরীর দিয়ে ঢেকে রাখবো তোমাকে আমি—তারপর তিনি আমাকে টুকরো ক'রে কেটে ফেলতে পারেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর লজ্জা আমি ছড়িয়ে দিয়েছি চারদিকে, চূর্ণ করেছি তাঁর দম্ভ, অপমানে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না মহেশ্বর চাটুয্যে। যে-মানুষ চারদিকে হুমকি দিয়ে বেড়ায়—আচার, ধর্ম, জমিদার, বামুন কিছুই গ্রাহ্য করে না, সেই মানুষ—সকলে তাকিয়ে দেখবে—তার নিজেরই বৌয়ের কাছে হাবলা বেতো বুড়োর মতো ঠ'কে যায়! এইজন্যেই—এইজন্যেই—এতদিন পর ভগবান আজ এমনি ক'রে তোমাকে এনে দিয়েছেন আমার কাছে।'

কথা শেষ ক'রে গৌরী হাঁপাতে লাগলো।

এই আলাপের ঠিক-ঠিক কথাগুলো আমার অবশ্য মনে নেই; যা বলা হয়েছিলো তার ভাবটা আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম। উপন্যাস লেখার অভ্যাসবশত এতে কিছু রং চড়িয়েছি কিনা জানি না—কিন্তু জীবনের তুলনায় কতটুকুই বা কাজ করতে পারে উপন্যাস, জীবনের এক মুহূর্তের স্পন্দনের কাছে সারা বিশ্বের সাহিত্যের মূল্য কতটুকু!

—স্পন্দন! ওই একটা জিনিশকে সত্য ব'লে জেনেছি আমি, যৌবনের প্রথম মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত আমি চেয়েছি—আর-কিছু না—স্পন্দিত হ'তে, স্পন্দিত হ'তে। 'ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, অর্থ, খ্যাতি, সুখ, দুঃখ, কিছুই কিছু না—একমাত্র যাতে এসে যায় জীবনে,

তা—হৃদয়ের স্পন্দন, স্নায়ুর কম্পন, রক্তের চঞ্চলতা। ও-রকম মুহূর্ত ক-টা আসে জীবনে? আর পাবার শক্তিই বা থাকে ক-জনের? জীবনে ক-বার কোনো নতুন আমেরিকার মাটি পেয়ে হাঁটু ভেঙে ভগবানের বন্দনা করি আমরা? বিরল, বিরল সে-সব মুহূর্ত, নিজেকে যখন আকাশের সমান ব'লে মনে হয়, সমুদ্রের অশান্তি ব'লে মনে হয়—কিন্তু ঐ সব মুহূর্তগুলোতেই সত্যিকার বাঁচি আমরা; অন্য সময়ে, বছরের পর বছর ভ'রে—শুধু নিশ্বাস নিই। যে-কোনো উপায়ে হোক—গান শুনে, বই লিখে, নেশা ক'রে, কিংবা কোনো পাথরের বা রক্তমাংসের রূপের সামনে দাঁড়িয়ে—সুখে হোক, দুঃখে হোক, অপেক্ষায় হোক, প্রার্থনায় হোক—স্পন্দন মানেই জীবন। হে সংসারের মানুষ—তোমরা যারা আপিশ করো, কর্তব্য করো, রবিবার দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে খুঁজে-খুঁজে কোনো ভায়রা-ভাই বা মাসতুতো বোনের বাড়িতে দেখা করতে যাও, আর রোজ রাত্রে একমাত্র স্ত্রীকে জড়িয়ে শুয়ে থাকো—তোমরাও কি জীবিত ব'লে জানো নিজেদের, তোমরা যারা পুরোনো পচা কাঠের মধ্যে মরচে-পড়া পেরেকের চেয়েও মৃত?

কিন্তু মানুষের মধ্যে আর-একটা বৃত্তি আছে—সেটাই শয়তানের দান—তার বুদ্ধি, তার চিন্তার প্রেরণা। আর তাই, গৌরীর দুই জোরালো বাহুর মধ্যে বাঁধা প'ড়ে, তার চুমোয়-চুমোয় অন্ধকারে ডুবে গিয়ে, কোমর থেকে গলা পর্যন্ত যখন ফেটে যাচ্ছে আমার, তখনও আমার মাথার মধ্যে অনেক কথার তোলপাড় থামলো না। হঠাৎ আমি বললাম, 'গৌরী, আমাকে ছেড়ে দাও।'

উত্তরে সে আরো নিবিড় ক'রে চেপে ধরলো আমাকে।

আবার বললাম, 'না, গৌরী। তাহ'লে পরে আর তোমাকে ভুলতে না পারি যদি? কেবল যদি তোমাকেই চাই?'

'পাবে। আমি চ'লে যাবো তোমার সঙ্গে—কোনো দূর দেশে—তোমার সঙ্গে। পারবে না নিয়ে যেতে?'

'তাহ'লে এখনই যেতে হয়—আজ রাত্রেই। আর তো সময় নেই।'

'অনেক রাত আছে এখনো। কথা বোলো না। এসো।'

তবু আমি বললাম, 'নৌকোতে স্টিমার-ঘাটে যেতে চার ঘণ্টা লাগে। খুব ভোরে নারানগঞ্জের স্টিমার আছে। সেখান থেকে মৈমনসিং, মৈমনসিং হ'য়ে কলকাতা।'

'বেশ তো।'

'তোমার টাকা আছে?'

'গয়না আছে।'

'তাহ'লে চলো। ওঠো।' আমি তাকে দুই হাতে ঠেলে দিলাম।

আমাকে আঁকড়ে ধ'রে বললে, 'একটু থাকো—আর-একটু। সব ভুলে যাবে।'

'সেই জন্যেই বলছি। যদি যেতে হয় তো এখনই। পরে পারবো না। ভুলে যাবো। ঘুমিয়ে পড়বো।'

'আমার মনে থাকবে। আমি ডেকে দেবো তোমাকে। অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়বো আমরা।'

'না। এখনই। এখনই চলো।'

আমি অনুভব করলাম গৌরীর দেহ হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। 'আসল কথা, তুমি ভয় পেয়েছো। সেই কথাই ভাবছো এখনো—তিনি যদি এসে পড়েন হঠাৎ!'

আমি এত জোরে উঠে বসলাম যে গৌরী ছিটকে পড়লো। 'কিন্তু তিনি থাকলে তুমিই বা এখন করতে কী?'

'কী করতাম ? এ-ই করতাম।' সে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। আমি তাকে বাধা দিলাম।

'না। করতে না। মুখে বলছো—কিন্তু করতে না।'

'প্রমাণ চাও ?'

'প্রমাণ দিতে পারবে না। কাল ভোর হবে—তিনি ফিরে আসবেন—সব বদলে যাবে।'

'তুমি কিচ্ছু বোঝো না !'

'আমি ঠিক বলছি। আমি কোনো সুযোগ নিতে চাই না। ডাকাতি আমার পছন্দ।'

'বেশ তো। কাল তুমি দাঁড়িয়ো তাঁর মুখোমুখি—সব বোলো। আমি ঠিক তোমার পাশে থাকবো।'

'তার আগেই আমি চ'লে যেতে চাই তোমাকে নিয়ে।'

'পালাতে চাও ?'

'তোমাকে চাই। এ ছাড়া পথ নেই তো এখন।'

'তার মানে—' অন্ধকারেও বুঝলাম তার মুখ কঠিন হ'য়ে গেলো—'তার মানে, তুমি সাবধানেই থাকবে যতক্ষণ না বিপদের বাইরে চ'লে যেতে পারো ? এই রকম তুমি ? এখন দেখছি ঐ চাবুকটা তোমার পাওনাই ছিলো।'

আমি খাট থেকে লাফিয়ে পড়লাম। সে ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো।

'না। যেয়ো না। তুমি যা বলবে আমি তা-ই করবো। তোমার দাসী হয়ে দেশে-দেশে ঘুরবো তোমার সঙ্গে। কিন্তু আজ না। আজকের রাতটা তুমি আমাকে দাও। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমার সঙ্গে থাকো তুমি। আর-কিছু ভেবো না। থাকো।' তার গলার আওয়াজ ভিজে

উঠলো, আমার মুখের উপর হাত চাপা দিলে যাতে আর কথা বলতে না পারি। আমি অবশ হ'য়ে বিছানার উপর ভেঙে পড়লাম।

পরের দিন আমাকে বিদায় দিতে গৌরী কেঁদেছিলো। আর আমি বলেছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বি. এ. পাশ ক'রে কিছু-একটা কাজকর্ম জুটিয়েই তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। কিন্তু পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগে কিছু নতুন খবর দেশে থেকে পৌঁছলো। বিধবা বিয়ে করে গ্রামের মধ্যে বসবাস করা আর সহ্য হচ্ছিলো না লোকেদের, আমার বাবার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো তারা। কোনো মানুষের কোনো জখম হয়নি; কিন্তু বাবা জমিজমা সব বেচে দিয়ে সপরিবারে আসাম চ'লে গেছেন—পরিবারের মধ্যে শীতল ভটচাযকেও বাদ দেননি। শোনা যায়, ভটচায-মশাইকে অংশিদার ক'রে তিনি এক ব্যবসা খুলেছেন সেখানে। সেই শেষ খবর পেয়েছিলাম বাবার। তারপর, এতকালের মধ্যে আর-কিছুই শুনিনি তাঁদের বিষয়ে—চোখে দেখা তো দূরের কথা। বাবা বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না, ভাই-বোনেরা কে কোথায় আছে তাও না।

আমি পরীক্ষা দিলাম না; একটা খবর-কাগজের আপিশে ষাট টাকা মাইনেতে চাকরি নিলাম। মাস ছয়েক পরে হুম ক'রে বিয়ে ক'রে ফেললাম একদিন।

পাঁচ

কোনো কাজ ক'রে আমি অনুশোচনা করিনি কখনো। কেন করবো? যা করেছি সজ্ঞানে করেছি, আমার ইচ্ছে না-হ'লে জোর ক'রে কেউ করাতে পারতো না। আর আমাদের ইচ্ছের উপর যখন আর কর্তা নেই, তখন আর খেদ কিসের। কিন্তু সম্প্রতি একটা কথা মনে হচ্ছে আমার, ঠিক মনে হচ্ছে তাও না—যেন পেরেক ঠুকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভিতরে: বিয়ে করা কখনোই আমার উচিত ছিলো না। সংসার করতে পারি না আমি, চাই না আমি; আমি জানি, তা যে চাই না আর পারি না: তবু ঐ অন্য কতগুলো মানুষের ভার নেয়া! যদি আমি আজ একা মানুষ থাকতুম, তাহ'লে আমি নিজেকে নিয়ে যা-কিছু করেছি আর করবো, তার জন্যে কারো কাছে কোনো জবাবদিহি ছিলো না। ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যেতুম। কিন্তু—আমার স্ত্রী নামে পরিচিত ঐ মানুষটি, আমার (আমারই) তিনটি (না চারটি?) ছেলেমেয়ে—কী হবে তাদের, কী খাবে তারা, কী করবে? ভিখিরি হবে, চুরি শিখবে, খেতে না-পেয়ে কি যক্ষ্মা হ'য়ে ধুঁকে-ধুঁকে মরবে, আর মরবার মুহূর্তে অভিশাপ দেবে আমাকে—আমি ম'রে গেছি ব'লেও ক্ষমা করবে না। —কেনই বা করবে। এ-ই আমার প্রাপ্য। অথচ, তাদের জন্য এতটুকু ভালোবাসা অনুভব করি না, যাতে তাদের কথা ভেবে বাঁচতে ইচ্ছে করে। আমিই বা করি কী।

এই একটা বোকামি করেছি জীবনে; এই একটা অন্যায় করেছি।

আমার মা-র এক জ্যাঠতুতো বোন কলকাতায় থাকতেন (এখনো

থাকেন—বাড়ি করেছেন গর্চা ফার্স্ট লেনে) ; তাঁর ভাসুরঝির সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করছিলেন তিনি। বোধহয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই (সাধু উদ্দেশ্য, দোষ দিচ্ছি না) মাঝে-মাঝে আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন। এই নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করতুম দুটো কারণে : আমার মাসিমার চেহারায় বা চরিত্রে এমন কিছু ছিলো না যাতে মা-র কথা মনে পড়ে, আর দ্বিতীয় কারণ—সুধা। সে রূপসী ছিলো না, গুণবতী ছিলো না, ছিলো ফর্শা আর পুষ্ট আর আহ্লাদি আর শান্ত গোছের। আমার সঙ্গে মুখোমুখি তার কথা হ'তো না, কিন্তু সে আমাকে জল এনে দিতো, চা এনে দিতো, আর নিচু হ'য়ে যখন পরিবেশন করতো আমি তার বুকের ভিতরটা দেখতে পেতুম।

—কিন্তু বিয়ে করেছিলুম কেন ? শুধু কি এই কারণে যে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য বাইরে আর ঘুরতে হবে না, বাড়ি এলেই পাওয়া যাবে ? হায়, তা যদি বলতে পারতুম তবু আমার ইজ্জৎ থাকতো ! কিন্তু তাও না, নিছক জৈব প্রয়োজনের সাফাইটুকু পর্যন্ত নেই আমার। সুধা আমাকে সে-অর্থে চঞ্চল করেনি (তা যারা করেছে, যেমন গৌরী, অর্চনা, তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ ঝাপসা হ'য়ে গেছে আমার, কিন্তু সুধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমি মনে-মনে বিশ্লেষণ করতে পারতুম)—না, তা নয়—সুধা আমাকে এনে দিয়েছিলো এক শান্ত, নরম, ঘরোয়া জীবনের ছবি, যার পিছনে আছে মানুষের বহু যুগের ইতিহাস, আর যেটাকে, কিছুদিন উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটাবার পর, আর গৌরীর অবসানের পর, মুহূর্তের জন্য রমণীয় ব'লেও মনে হয়েছিলো আমার। (সত্যি কি অবসান হয়েছিলো ? কী দীর্ঘ আকাশ ভ'রে সেই অস্তরাগ ! না কি সেটাকেই চাপা দেবার জন্য এই চেষ্টা ?)

কিন্তু সংক্ষেপে বলতে হবে। কোনো-কোনো কথা নিজের কাছেও বলতে পারি না, এই নির্জন কাগজেও লিখতে পারি না।

আমার জীবনের সব দুর্ভাগ্যের একটা কারণ এই যে মানুষের কথার প্রভাব আমার মনের উপর ভয়ানকরকম প্রবল। র—বাবু ('মালঞ্চের'র সম্পাদক—সকলেই নাম জানেন) বহুদিন আগে একবার বলেছিলেন : 'সত্যিকার লেখক তুমি।' সেই কথাটা মগজ থেকে সরাতে পারিনি (যদিও নিজে আমি ভালোই জানি যে সত্যিই আমি সত্যিকার লেখক নই) ;—তারই ঠেলায় অনেকগুলো (অন্তত বেশ কয়েকটা) বই লিখে ফেলেছি। বাবা যেই বললেন 'তোমার মা'— সেই একটা কথায় আমার সকল রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠলো। আর মাসিমা বার-বার বললেন—'ও তোর বৌ হ'লে তুই সুখী হবি—ভারি ভালো মেয়ে'—ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা নিয়েও শুনে-শুনে একদিন বাঙাল ভাষার 'বৌ' কথাটা ভারি ভালো লেগে গেলো। এমনকি বাংলা গল্পের 'কেরানির নীড়'টাকেও চেষ্টা ক'রে দেখবার অযোগ্য মনে হ'লো না।

—কিন্তু ক-দিন টিঁকেছিলো? খুব, খুব অল্পদিন। এক বছরের মধ্যেই আমার প্রতিকারহীন ভুল আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সুধাকে দোষ দিই না, সত্যিই সে যাকে বলে 'ভালো মেয়ে', এর চেয়ে সৌভাগ্য নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য ছিলো জীবনে। কিন্তু ঐ 'ভালোত্ব'ই আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। আমি নিজেকে দেখতে পেলাম এমন একজন মানুষের মুখোমুখি যে কখনো বাধা দেয় না, প্রতিবাদ করে না, কোনো আঘাত করে না মনের উপর। স্বামীর ব্যবহারের জন্য একটি পাত্র ব'লেই নিজেকে ভাবে সে, তার কাছে কোনো আহ্বান নেই, প্রত্যাখান নেই, অবহেলাও নেই। এক কথায়, কোনো চরিত্র নেই

মানুষটার—আসল অর্থে মনুষ্যত্বই নেই। রান্না থেকে বাসন মাজা সবই করে—নালিশ নেই—হঠাৎ সচ্ছলতা হ'লেও কোনো শখের কথা বলে না। মাঝে-মাঝে বাংলা সিনেমায় বা আত্মীয়-বাড়ি যাওয়া—তার শখের ধারণা এর উর্ধ্বে ওঠে না। ছুটোতেই আমি যখন 'না' বলি, চুপ ক'রে থাকে, শহীদের মতো মুখ ক'রে তাকিয়ে থাকে। 'একা যাও না।' 'না, থাক।' পাশের বাড়িতে রেডিওর শুক্কুরবারের নাটক শুনতে যাবে, আমি যদি বলি, 'কী বিশ্রী!' তখনই জবাব: 'তাহ'লে না গেলাম।' 'কেন? আমার বিশ্রী লাগে, তাতে তোমার কী?' 'থাক।' আমার এক-এক সময় মনে হয়েছে আমাকে তার কাছে অপরাধী ক'রে তুলেই সে কুটিল একরকম সুখ পায়, কিন্তু বুদ্ধির জন্য অত উঁচু নম্বরও তাকে দিতে পারি না। নেহাৎই সেই ধরনের নিস্তেজ মন, যাতে কিনা, অমুকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ব'লেই, তার প্রত্যেকটি আচরণ প্রশংসাযোগ্য—অন্তত সমর্থনযোগ্য—হ'য়ে ওঠে। আস্তে-আস্তে সেই শহীদের করুণতা (বিশেষত দ্বিতীয় বছরে একটা মৃত সন্তান প্রসব করার পর), তার মুখের উপর শক্ত হ'য়ে এঁটে গেলো, তার দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি আমি কত বড়ো দুর্জন—যদিও তখন পর্যন্ত তার সঙ্গে চলনসই গোছের ভালো ব্যবহারই আমি করেছি। আর এর পর থেকেই আমার চেষ্টা হ'লো তার কাছে নিজেকে অপ্রীতিকর ক'রে তোলা (রাত্রে বাড়ি না-ফিরে, নেশা ক'রে ফিরে ইত্যাদি)—যাতে সে আমাকে ঘৃণা করতে শেখে, ঘৃণা ক'রেও রেহাই দেয় আমাকে, অন্তত মুখের ভাবটা বদলায়। সে কেঁদেছে, অনুনয় করেছে, নিশ্বাস ফেলেছে, আমার রাগের ভয়ে (আর পড়শিদের ভয়ে) মুখ বুজে চুপ ক'রে থেকেছে, কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। একবার ছাড়া।

(কিন্তু আমার মতো অসুরের বিরুদ্ধে কী করতে পারতো একজন

বেচারা, আদরে পালিত, ভদ্রসন্তান বাঙালি মেয়ে? আর আমার এ-সব কথা মানুষের গড়া পদানত সিংহের মূর্তি বই তো নয়: আমিই বলছি, তাই আমারই মনোমতো ক'রে বলছি। আসল কথা, স্বর্গ থেকে দেবী এনে দিলেও আমি কয়েক দিনেই তার অসংখ্য দোষ আবিষ্কার ক'রে ফেলতুম। আসল কথা, বন্ধনই আমার সহ্য হয় না।)

আমার ছেলেমেয়েদের জন্মাতে দেখেও আমি সুখী হ'তে পারিনি। আমি চাইনি তাদের, প্রক্ষিপ্ত এবং বিজাতীয় বস্তু ছাড়া আর-কিছুই তাদের আমার মনে হয়নি। হয়তো আজকালকার অনেক বাবারই প্রথমে তা-ই মনে হয়; পরে, সমাজের চাপে, অন্যদের উদাহরণে, আর সবচেয়ে বেশি স্ত্রীর প্ররোচনায়, তারা অবাঞ্ছিতকে বাঞ্ছনীয়ে পরিণত করতে শেখে। ('পুত্রার্থে প্রিয়তে ভার্যা'য় অন্তত এটুকু সুনীতি ছিলো যে মানুষগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকাঙ্ক্ষিতভাবে জন্মাতো— আজকালকার মতো দৈবাৎ বা অবিবেচনার ফলে ভূমিষ্ঠ হ'তো না।) কিন্তু আমার বেলায় তার একটি প্রভাবও খাটলো না; যখন তারা একটু বড়ো হ'য়ে উঠে আমার সংকীর্ণ ঘর কোলাহলে আর নোংরামিতে ভ'রে তুললে, আমি এক-একদিন লেখার ব্যাঘাতে ক্ষিপ্ত হ'য়ে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছি তাদের গায়ে, লাফিয়ে উঠে তাড়া করেছি ফুটপাতে। আর যতদিনে তারা অনেক-কিছু বোঝার মতো বড়ো হ'লো আমি ততদিনে বাড়িতে এত কম সময় থাকি যে দেখাশোনাই প্রায় হয় না। —এর মধ্যে শুধু একটুখানি রুপোলি রেখা আমি দেখতে পেয়েছিলুম: সেটা এই যে ওরা সুধার আর আমার মধ্যে দেয়ালের কাজ করবে, আমার বিরক্তির জন্য একটি করুণ মুখ সাজিয়ে রাখা ছাড়াও আরো কিছু করবার থাকবে তার। কিন্তু আস্তে-আস্তে তারাও তাদের মা-র মতোই মুখের ভাব আয়ত্ত ক'রে নিলে; একজনের বদলে, আমি আমার

দুষ্কর্মের চার-পাঁচজন ম্লান ও জীবন্ত প্রমাণ আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। কিন্তু আমার প্রতি আর কোন মনোভাবই বা সম্ভব ছিলো তাদের—তারা, আধ-পেটা-খাওয়া, ছেঁড়া-কাপড়-পরা, মাইনে-না-দিয়ে-স্কুলের-নাম-কাটানো, আর আমি কলম নিয়ে টেবিলে বসলেই গাল খাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত। আমি সংসারের কোনো কাজ করবো, এই আশা বিসর্জন দিতে সুধাকে অনেক আগেই বাধ্য করেছিলাম আমি: আর সে আমার দিকে একবার উল্লেখমাত্র না-ক'রে, তার ছেলেমেয়েদের নিয়েই সবটা চালিয়াছে ব'লে শেষ পর্যন্ত আমিই বাড়ির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়লাম।

গৌরীর সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর (তার সংঘাতের পর, বলা উচিত) আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়েছিলো যে একবার শরীর দিয়ে ভালোবাসতে পারলেই তা-ই থেকেই মনের ভালোবাসা জন্মায়। কতটুকু, কতক্ষণের সেই দেখা—তবু কলকাতায় এসে অনেকদিন পর্যন্ত চৈত্রমাসের পাতার মতো কেঁপেছিলাম আমি, তাকে ছাড়া আর-কিছুই ভাবতে পারিনি। (তখনই আমি বুঝেছিলাম আমার মন ভিতরে-ভিতরে কত দুর্বল, এ-সব ব্যাপার হালকাভবে নিতে পারি না, ঘুমের পরে সকালে উঠে ভুলে যাবার ক্ষমতা আমার কত কম। আর সেই থেকে, যেখানে নগদ দামেই সব চুকে যাবার কথা, সেখানেও কখনো স্বচ্ছন্দ হ'তে পারিনি আমি, সর্বদাই ভয় পেয়েছি পাছে হঠাৎ 'প্রেমে প'ড়ে গিয়ে' তাদের অবজ্ঞাভাজন হ'য়ে পড়ি।)—আমি তাই এমনও আশা করেছিলাম যে শরীরটাকে উনুনে চাপালেই তারই উপর ভালোবাসার সর পড়বে—কিন্তু হিশেবে ভুল হ'লো, দেহের কাছে ঠ'কে গেলাম এবার, সে উল্টো ব্যবহার করলে আমার সঙ্গে। বুঝিয়ে দিলে, তার তৃপ্তি শুধু তারই মধ্যে নেই, চাবি নিয়ে ব'সে আছে মন। সেই

মন যদি জেগে না ওঠে তবে কিছুই কিছু না। অথচ—আশ্চর্য এই—মন তার দরজাই খুলবে না যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের আঘাত পড়ে সেখানে। আমাদের দেহ আর মনের কী যে ঠিক সম্বন্ধ আমি আজ পর্যন্ত তার কূল-কিনারা পাইনি।

পড়তে ভালো লাগে না আমার, কেমন নিষ্ক্রিয় মনে হয় ওটাকে, খানিকটা বাবুগিরির মতো। কিন্তু আমিও মাঝে-মাঝে পড়ার জ্বরে পড়েছি—ঠিক ইনফ্লুয়েঞ্জারই মতো তার আক্রমণ। যেমন এক-একবার সাতদিন ধ'রে অবিশ্রাম মদ খেয়েছি, তেমনি তিন, চার, পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে প'ড়ে থেকেছি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে (তখন তা-ই নাম ছিলো)। কোনো বিষয়েই ধারাবাহিক শিক্ষা নেবার ক্ষমতা নেই আমার, এলোমেলো, আবোলতাবোল প'ড়ে গেছি প্রায় কোনোরকম বাছ-বিচার না-ক'রে। এইভাবেই একবার শোপেনহাওয়ার পড়েছিলাম। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিলো এই কথাটা প'ড়ে যে কোনো ঘটনাকে আমরা ইচ্ছে করেছি ব'লেই সেটা ঘটতে পারে। অর্থাৎ মনই কর্তা: আমাদের ইচ্ছাশক্তি সব-কিছু ঘটাচ্ছে। অনেক, অনেকদিন এই কথাটাকে নিয়ে ভেবেছি আমি। তাহ'লে: যার শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু প্রবেশ করলে, সেও কি ইচ্ছে করেছিলো সেটা? আর যে-লোকটা মোটর-চাপা প'ড়ে মরলো, সেও? এ-কথার কোনো স্পষ্ট জবাব আমি পাইনি—চেষ্টাও করিনি তার জন্য; কিন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তির কী যে ভীষণ জোর আমি তো তা হাড়ে-হাড়েই বুঝেছি। আমি ইচ্ছে করিনি ব'লেই সুধাকে ভালোবাসতে পারিনি; আমি ইচ্ছে করেছি ব'লেই এই আরোগ্য-নিকেতনে এসেছি।

কিন্তু এই ইচ্ছেটা একটু বাঁকা পথে কাজ করে। নিশ্চয়ই—যদিও তখন তা জানতুম না—আমার কয়েকটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে

হয়েছিলো, কিন্তু স্থির হ'য়ে টেবিলে বসতে সহজে রাজি হবো তেমন মানুষ তো আমি নই। নিজেকে বাধ্য করতে হ'লো সেইজন্য। হঠাৎ একদিন (তখন সেই খবর-কাগজের উন্নতি হচ্ছে, মাইনে বাড়ছে লোকদের), চাকরিটা ছেড়ে দিলুম। নিজেকে বললুম, টেলিগ্রামের তর্জমা করা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে আমার, অসহ্য এই খবর-কাগজের আবহাওয়া। যা পানের পিক! যা কেচ্ছা! যা রাজা-উজির! আমার বিয়ের পর চার বা পাঁচ বছর কেটেছে তখন, দুটো শিশু হাঁটতে আর চ্যাঁচাতে পারে, মূর্তিমান খিদের মতো ঘুরে বেড়ায়। রোজগারের অন্য উপায় জানি না ব'লে লিখতে বসলুম। তার জন্যে সারাদিন বাড়ি থাকতে হয়। এই সময়েই পর-পর কিছু বই লিখে ফেলেছিলুম; আর এই সময়েই আমার স্ত্রী আর সন্তানের প্রতি—এতদিন যা ছিলো উদাসীনতা, তা রীতিমতো বিরুদ্ধতায় দানা বাঁধলো। লিখতে বসলে বড্ড মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায় আমার, কাছাকাছি কাউকে সহ্য করতে পারি না। (আমার উচিত ছিলো বাইরের কোনো কাজ নেয়া: কোনো ব্যবসা, ঘুরে-ঘুরে দালালি, সার্কাসে বেচার জন্য জানোয়ার ধরার বিদ্যে শিখলে বেশ হ'তো। লেখার কাজে ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে একটা জিনিশ ভাবতে হয়—তার মতো অত্যাচার আর কিছুই নেই।)

সে-সব দিনে লেখায় আমার বেগ ছিলো আশ্চর্য—আর আজ পর্যন্ত যেটা আমি তাড়াতাড়ি ফাটিয়ে দিতে না পারি সেটা আমি পারিই না। যেন ফিরে-ফিরে একটা বিষ জ'মে উঠেছে শরীরে, সেটাকে বের ক'রে দিতেই হ'লো। যদি কোথাও ঠেকে গেছে, তার মানেই অসুখটা এখনো 'তৈরি' হয়নি—ছেড়ে দিয়েই ভুলে যেতে পেরেছি। কিন্তু বলীয়ান বীজাণুগুলো রেহাই দেয়নি আমাকে; আমার অন্ত্রতন্ত্র খুঁড়ে-খুঁড়ে কাজ ক'রে গেছে। তাই লেখার সময় আমার এত মেজাজ,

এত অস্থিরতা, আমার কাছে অন্যেরা এবং অন্যদের কাছে আমি এমন অসহনীয়। সেই সময়টায়—হয়তো মাত্রই তিন কি চার বছর তার মেয়াদ, আমার বয়স তখনো তিরিশের নিচে—সেই সময়টায় ভূতের মতো লিখেছিলাম, কেমন ক'রে রাত কেটে গেছে বুঝিনি, খেতে ভুলে গিয়েছি কতদিন। চোখে ঝাপসা দেখেছি, কলম-ধরা আঙুলের ডগা কেঁপেছে—কিন্তু ক্লান্তিতে নয়, আনন্দে।

—আনন্দ! ঐ কথাটা উচ্চারণ করার অধিকার কি আছে আমার? আনন্দ কাকে বলে তা কি আমি কখনো জেনেছি? এমন কোন শিখরে আমি দাঁড়িয়েছি যেখান থেকে পাতালের হাঁ স্পষ্ট দেখতে পাইনি? এমন কোন উষা দেখেছি, যা আমার বুকে বর্শা হ'য়ে বেঁধেনি? কিন্তু তবু--কিন্তু তবু। আমার চোখ গৌরীকে দেখে ঝাপসা হয়েছে: এও সেই রকম। তার চোখের ঝড় কাঁপিয়ে গেছে আমাকে: এও সেইরকম। এমনকি, বেশি আরো বেশি। লেখার সময় আমি যেন অন্য জগতে চ'লে গিয়েছি—না, শুধু আমি নই, কিংবা আমিই শুধু নই—পৃথিবীর কোটি-কোটি শূকরের মতো মানুষ, যারা জন্ম নেয় আর জন্ম দেয় আর ম'রে যায়—তারা সকলেই এক উন্নত উজ্জ্বল জগতের অধিবাসী হ'য়ে গেছে, তাদের ইতরামো, তাদের নষ্টামি, তাদের ন্যাকামি—এ-সব সত্ত্বেও, বা এ-সমস্ত নিয়েই—নিজের পায়ের উপর বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তারা—কোনো মন্দিরের গায়ে রাক্ষসের কদাকার মূর্তিও যেমন কুৎসিত হয় না, তেমনি ক'রেই দেখতে পেয়েছি আমি তাদের। এই পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আমি সহ্য করতে পেরেছি তখন। আমার বাবাকেও ক্ষমা করতে পেরেছি।

কিছুদিন শুধু লিখেই সংসার চালিয়েছিলুম—যদি তাকে চালানো বলা যায়। যা টাকা হাতে আসে, তার অর্ধেকের বেশি সুধার হাতে

পড়ে না। এক-একটা বই শেষ ক'রে উঠে মদের মধ্যে ডুবে থাকতে হয় কয়দিন। ফিরে এসে দারিদ্র্য—নোংরা দারিদ্র্য, অভিযোগে ভরা ফ্যাকাশে আর নিঃশব্দ কতগুলো মুখ। নোংরামি জিনিশটার মজা এই যে সেটাকে যে রচনা করে সেও সেটাকে কম ঘৃণা করে না—এ-সবের জন্য আমিই দায়ী ভেবে আরো বেশি দম আটক আসে আমার। ততদিনে ছেলেমেয়েরা বড়ো হ'য়ে উঠছে, আমাকে বিষের চোখে দেখতে শিখছে। সুধা—এই অভাব সত্ত্বেও—আরো মোটা হয়েছে; ভগবানের ক্ষণিক দান যৌবনের রং মুছে যাবার পর ভগবানের স্থায়ী দান তার বোকামিটা প্রকট হ'য়ে উঠেছে তার মুখে। আস্তে-আস্তে বাড়ি আমার অসহ্য হ'য়ে উঠলো। অথচ লিখতে হ'লে বাড়ি থাকতে হয়। তাই—আর তখন যুদ্ধের জন্য খরচ বেড়ে যাচ্ছে ব'লে আমি আবার চাকরি খুঁজতে বেরোলাম। ওষুধের কারখানায় কেরানিগিরি, রেডিওতে কেরানিগিরি, বিজ্ঞাপনের আপিশে কেরানিগিরি—তা ছাড়া আর কী আছে বাঙালির জীবনে? —কোথাও ছ-মাস, কোথাও বা দু-মাসেই ইস্তফা। আমার কাগজের নৌকো এঁদো নালায় বানচাল হ'লো—আর আমি একদিন কলম্বাসের স্বপ্ন দেখেছিলাম।

(কিন্তু যারা বলে 'দারিদ্র্যের জন্য' আমার লেখা হ'লো না, তারা কিছুই বোঝে না। আমার ঐটুকু বলবার ছিলো; ঐটুকুই বলেছি।)

আর এই রকম সময়েই অর্চনার সঙ্গে আমার দেখা হ'লো। এখানে অর্চনাই বলছি—যদিও আসলে তাকে নাম ধ'রে ডাকিনি কখনো। শুধু একদিন—কিন্তু সে-কথা পরে।

ছয়

যুদ্ধের জন্য গজিয়ে ওঠা অসংখ্য নতুন আপিশের মধ্যে একটাতে ঢুকে পড়েছি তখন। সেই আপিশে একদিন প্রফুল্ল রায় কর্তা হ'য়ে এলো।

প্রফুল্ল রায় নামটা খুব সাধারণ, কলকাতার প্রত্যেক রাস্তায় একজন ক'রে পাওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু একদিন ঐ নামে একটু দীপ্তি লেগেছিলো—অন্তত অল্প কয়েকজনের চোখে। তাকে নিয়ে বলাবলি করেছে যুবকের দল—কখনো বুড়োরাও—আর তখনো সে কলেজে-পড়া ছোকরা মাত্র। তার 'হীরা ও হাওয়া' নামের কবিতার বই (প্রথম এবং শেষ বই) আমিও পড়েছিলাম। ঠিক সেই রকম বিজ্ঞ, চতুর, অকালপক্ক, ফুর্তিতে আর বিষাদে ভরা লেখা, যাতে কোনো খুঁত নেই ব'লেই মনটা যেন খুঁতখুঁত করে, আর যা প'ড়ে ঐ বালকের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কৌতূহলী আর উদ্বিগ্ন হ'তে হয়। সেই উনিশ কিংবা কুড়ি বছর বয়সেই—তার বইয়ের নাম থেকেই তা বোঝা যায় —ঐ বয়সেই সে দেখতে পেয়েছিলো, দেখাতে চেয়েছিলো, মানুষের জীবনে শাশ্বত আর ক্ষণিকের বিরোধ, আর ও-দুয়ের নিত্য সম্বন্ধ। দেহের জীবনের বিরুদ্ধে মনের জীবন, ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধি, হৃদয়ের পরিবর্তমান সুখদুঃখের পিছনে বর্বর, জড়, গণিতে বাঁধা উদাসীন প্রকৃতি। আর এই দ্বন্দ্বের কথা সে বলেছিলো ছোটো-ছোটো ছন্দে-বাঁধা কাহিনীতে, হালকা রূপকথায়, আমোদে মাখা ছবির সাহায্যে—কখনো এত হালকা যে তার অর্থ আরো অবাক ক'রে দেয়:

যেমন (এখনো মনে আছে আমার) নিকুঞ্জে শুয়ে-থাকা প্রণয়ীযুগলের উপর গাছের পাতা ঝ'রে পড়ছে, এই ছবির মধ্যে সে ফুটিয়ে তুলেছিলো একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়বিলাস আর তার অবসানের বেদনা। তার লেখা ভরপুর ছিলো রবীন্দ্রনাথে, অথচ তার মধ্যে কিছু ছিলো (আর সেটাই তার সারবস্তু) যা রবীন্দ্রনাথে নেই। তা যদি না হ'তো তাহ'লে আমি তার লেখা কখনো পড়তুম না।

প্রফুল্ল আর আমি একই সময়ে কলেজে পড়তুম, কিন্তু সে ছিলো প্রেসিডেন্সি কলেজে, আর তাছাড়া আমার মেলামেশায় মন ছিলো না। তবু তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে সেই সময়ে : প্রথম বোধহয় 'মালঞ্চ' আপিশে, সেখান থেকে বেরিয়ে কোনো চায়ের দোকানে আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট কাটিয়েছি। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি আমার প্রতি তার অনুরাগ, আমার সঙ্গে বন্ধুতা করার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমি বড্ড একরোখা আর অমিশুক মানুষ : যখন আমি কড়া রকমের ফুর্তি জোটাতে না পারি তখন আমি একা থাকতেই ভালোবাসি, আর 'সাহিত্যে'র বিষয়ে কথা বলতে বিশ্রী লাগে আমার। আর তাই, যদিও পেশাদার অর্থেই লেখক হ'তে হয়েছে আমাকে (ঈশ্বর জানেন, টাকার জন্য !), তবু আমি সাহিত্যিক আড্ডার দূরে-দূরেই থেকেছি, ওখানকার কথাবার্তা যেটুকু শুনেছি কোনো সুখ পাইনি। আমার বরং ভালো লেগেছে বস্তির ঝিয়েদের পিছনে হেঁটে-হেঁটে তাদের 'মনোগত' কথা শুনতে (দু-জন হ'লেই অনেক কথা বলে তারা)—এ-রকম অনেক হেঁটেছি আমি—শুধু তাদের কথা শোনারই জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়।

আর তাছাড়া প্রফুল্লর সামনে কী-রকম একটু অস্বস্তি লেগেছে আমার ; বেশি ভণিতা না-ক'রে তার সহৃদয়তা প্রত্যাখ্যান করেছি ;

আমি হাত নাড়তে পারার আগেই চা আর অমলেটের দাম সে চুকিয়ে দিয়েছে—আর আমি ইচ্ছে ক'রে উল্টো দিকের বাস্ ধরেছি যাতে তার সঙ্গে আর থাকতে না হয়।

আমার ভাবতে অবাক লাগছে যে প্রফুল্লর তখনকার চেহারা এত স্পষ্ট মনে আছে আমার। ছিপছিপে, মাঝারি লম্বা, শরীরের এমন মানানসই গড়ন যে সে কোনো ঘরে ব'সে থাকলে হঠাৎ তাকে চোখে পড়ে না, রেস্তোরাঁর ঘেঁষাঘেঁষি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সময় চেয়ারটা একটু বেঁকেও যায় না এমনকি। ডিমের ছাঁদের মুখ, থুৎনিতে একটু আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে—তার জন্য তাকে ঈষৎ দুর্বল আর অসহায় মনে হয়—অথচ ছোটো আর সোজা নাকটির দু-পাশে শান্ত আর বুদ্ধিমান চোখ প্রতিজ্ঞায় ভরা। মাথার বাঁ দিকে সিঁথি ক'রে ডান দিকের চুলে একটু সেকেলে ধরনে ঢেউ খেলিয়ে দেয়—তাকে মানিয়ে যায় সেটা—চুলের তলায় কপালটি খুব পরিষ্কার, সেখানে তার কথাবার্তার ছায়া পড়তে দেখিনি, যদিও চোখের তলায় ছোটো একটা শিরা ফুলে উঠেছে মাঝে-মাঝে, আর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠে চোখ পর্যন্ত আলো ক'রে তুলেছে। সারা মানুষটার মধ্যে একটা অবর্ণনীয় (প্রায় অসহনীয়) পরিচ্ছন্নতা ছিলো: তার জামা-কাপড়ে, দাঁতে, নখে আর বাদামি রঙের চামড়ায়, এমনকি তার হাত নাড়ায়, তার চলাফেরায়। হ্যাঁ—এইবার পেয়েছি ঠিক কথাটা, তাকে যে অমন ছিমছাম, সুসম্পূর্ণ মনে হ'তো তার জন্য দায়ী তার চেহারা নয়, তার নড়াচড়ার মৃদুতা, চোখে-না-পড়ার মতো সংগতি—আক্ষরিক অর্থে সুষমা। কিংবা হয়তো তার মুখ-চোখও এই সৌষম্যের অংশ মাত্র, তার মনই তৈরি ক'রে নিয়েছিলো তার চেহারাটাকে—হঠাৎ তার এক-একটা ভঙ্গিতে আমার মাকে মনে প'ড়ে গেছে আমার। হয়তো সেইজন্যই অস্বস্তি বোধ করেছি।

এখন দেখছি তাকে আমি খুব মন দিয়েই লক্ষ্য করেছিলাম, আমার মনের উপর রীতিমতো ছাপ রেখেছিলো সে—যদিও বেশি বার তার সঙ্গে দেখাশোনা হয়নি। অথচ পনেরো বছর পর তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারলুম না।

কিন্তু কী-রকম অবস্থার মধ্যে দেখা হ'লো সেটা আগে বলা দরকার।

আপিশে, পঞ্চাশ কেরানির সঙ্গে, মস্ত হল-ঘরে আমার বসবার জায়গা। টেবিলটা একটু বড়ো, সে-টেবিলে একটা টেলিফোনও আছে : এইটুকু তফাৎ। নতুন ডিরেক্টর-সাহেব একদিন সেই হল-ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন। আমি লক্ষ্য করলুম ছোকরা কেরানিরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু আমি অতিশয় ব্যস্ততার ভান ক'রে যে-কোনো একটা কাগজের উপর চোখ দুটোকে আটকে রাখলুম। তিনি এসে আমার পাশের টেবিলে দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বললেন; সে-ভদ্রলোকের দাঁড়ানো দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে গেলো (আড়চোখে সবই দেখে নিচ্ছিলাম আমি), আমার পিঠের উপর কয়েকটা কটাক্ষপাত অনুভব করলাম। ছুটি হবার মিনিট দশেক আগে চাপরাশি এসে বললে সাহেব আমাকে 'সেলাম জানিয়েছেন'।

চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে উঠে এলাম। একটু অবাক হলাম, যখন 'সাহেব' আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললেন, 'বসুন। অনেকদিন পর দেখা হ'লো। কেমন আছেন?' তারপর, আমাকে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় দেখে : 'আমি প্রফুল্ল রায়। "কবি" প্রফুল্ল রায়।' কথার উচ্চারণে কোটেশন-চিহ্নটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে।

এ-কথা শুনে আমি বোধহয় আধ মিনিটখানেক শুধু তাকিয়েই

ছিলাম তার দিকে। আমার সামনে উপবিষ্ট 'সাহেব'টিকে এককালের চেনা 'প্রফুল্ল রায়ে' তর্জমা ক'রে নিতে ঐটুকু সময় লাগলো। না-চেনার কোনো কারণ অবশ্য ছিলো না: আশা করিনি, ভাবিনি, কল্পনাও করিনি ব'লেই ভুল হয়েছিলো। শুধু যে পি. কে. রায় নাম শুনে প্রফুল্ল রায়কে অনুমান ক'রে নিতে পারিনি তা নয়, প্রফুল্ল রায় নাম শুনলেও কিছুই মনে হ'তো না আমার: সেই 'কবি'কে, 'হীরা ও হাওয়া'র লেখককে বহু আগেই ভুলে গিয়েছিলাম—মনে রাখার বা মনে পড়ার কোনো কারণই ছিলো না: এতগুলো বছরের মধ্যে আর-কিছুই লেখেনি সে, কোথাও তার নাম শুনিনি—লেখকদের এক-নম্বর গোয়েন্দা 'মালঞ্চ'-সম্পাদক র—বাবুর মুখেও না। আর সেই আপিশের কামরায় মস্ত টেবিলে মুখোমুখি তাকে চিনতে পেরে, আমি প্রথমে মনের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করলাম। আমার একটা গোপন মোহ ভেঙে গেলো।

—এই পরিণাম! যে-ছেলে উনিশ বছর বয়সে অবাক ক'রে দিয়েছিলো, সে এখন সরকারি আপিশে ডিরেক্টর বা ডেপুটি-ডিরেক্টর পদবীর তলায় কবর দিয়েছে নিজেকে। একদিন যে মায়াবীর মতো কলম চালিয়েছে সেই এখন সারাদিন ব'সে দিস্তে-দিস্তে ময়লা কাগজে সই লাগায়। একদিন যার কোনো-একটা শাশ্বতের জন্য তেষ্টা পেয়েছিলো, এখন সে যে-কোনো এক পুঁচকে মন্ত্রীর হুকুম খাটে। মন্ত্রী কী? গবর্নর কী? কোনো-একজন মস্ত চাকুরেই বা কী? একটা চেয়ার, একটা আসন, একটা খেতাব। একজন চ'লে যায়, অন্য একজন এসে বসে সেখানে, সেই অন্য জনকেই তৎক্ষণাৎ সেলাম করতে থাকে লোকেরা। কিন্তু একজন কবি! তার মূল্য তার নিজেরই জন্য, তার নিতম্বের তলায় কোনো গদির জন্য নয়। খেপিয়ে-তোলা

জনগণের ভোটের জন্যও নয়। তার কোনো আসন নেই, কেউ তাকে সনদ দেয়নি। সে আছে : এই কথাই সব। তার পরে অন্য কবি আসবে, কিন্তু তার বদলে কেউ আসবে না। আরো অনেক কবি হবে, কিন্তু সেও থাকবে।

আমি না-হয় নিজেকে নষ্টই করেছি, কিন্তু প্রফুল্ল রায় কেমন ক'রে তা পারলো—সে, এত স্থির, বুদ্ধিমান, এমন হালকা, মৃদু, সংযত তার নড়াচড়া, যেন সব উত্তম ঠিক সময়ে খরচ করার জন্য জমিয়ে রাখছে। কিন্তু জমিয়ে রেখেছিলো—এইজন্যেই ?

ভাবে-ভঙ্গিতে একই রকম আছে। মুখটা একটু ভরা আর লালচে হয়েছে, চুল পাৎলা আব ওল্টানো ; তাছাড়া আর লক্ষ্যণীয় বদল হয়নি। টেবিলের উপর যে-হাতটা রেখেছে তা তার ছেলেবেলার মতই কমনীয় ; যখন উঠে দাঁড়ালো তার ঈষৎ সরু কাঁধের আর পরিষ্কার-ছাঁটা ঘাড়ের ভঙ্গিতে সেই রকমই কিশোর লাবণ্য দেখতে পেলাম। একটি ঢিলেঢোলা, চমৎকার স্যুট তার পরনে (আমিও বুঝতে পারছিলাম সেটা চমৎকার) ; হাওয়াই-শার্টের ফ্যাশনে ধরা না-দিয়ে নেকটাই আর কোট দুটোই পরেছে। কোনো ক্ষোভ অথবা অসন্তোষের লেশমাত্র চিহ্ন নেই মুখে, কৃতী অথবা ব্যস্ত লোকদের বিস্ফার বা অন্যমনস্কতাও নেই।

দেখা গেলো, তার আর আমার পথ অনেকদূর পর্যন্ত একদিকে। আমাকে তার গাড়িতে আহ্বান করলে। নিজেই চালায় ; রাস্তায়, ট্র্যাফিকের আলোর উপর নজর রেখেও, ফাঁকে-ফাঁকে কথা বললে। আমার সব ক-টা বই পড়েছে বুঝলাম (যে-কাজ র—বাবু ছাড়া আর-কেউ করেছে ব'লে জানতুম না) ; কোনটার পর কোনটা বেরিয়েছে তা পর্যন্ত জানে ; আর সেগুলো থেকে এমন দু-একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ করলে, যা আমাকে বেশ চেষ্টা ক'রে মনে আনতে হ'লো।

আমাকে জিগেস করলে, এখন কী লিখছি। উত্তরে আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি আর কবিতা লিখছেন না?' 'পারি না লিখতে।' তখন আমার মনে পড়লো যে 'হীরা ও হাওয়া'র পরে আর-কোনো নতুন লেখকের কবিতার বই আমি পড়িনি। তাকে বললুম সে-কথা। আমার দিকে চকিতে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'পড়েননি? অনেকেই ভালো লিখছেন কিন্তু।' আমি হেসে বললাম, 'আমি কিছুই পড়ি না। পড়তেই ভালো লাগে না আমার।' 'অবশ্য নিজে কিছু লিখতে থাকলে অন্যের লেখা পড়া যায় না।'

'কিছু লিখছিও না এখন। কিন্তু আপনি ছেড়ে দিলেন কেন?'

উত্তরে সে জানালে যে কারণটা একটু হাস্যকর। বললে, না-প'ড়ে যেমন কেউ লিখতে শেখে না, তেমনি বড্ড বেশি পড়ার ফলে নিজের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে কেউ-কেউ। কোনো ভালো লেখা প'ড়ে উৎসাহ জাগে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ভালোটাই জঙ্গলের মতো ছড়িয়ে প'ড়ে চারাগাছকে মেরে ফেলতে পারে। তার বেলায় তা-ই হয়েছিলো। অল্প বয়সেই অনেক বেশি পড়েছিলো সে, বোকার মতো পড়েছিলো। নানা দেশের উৎকৃষ্ট লেখার উদাহরণ যতই সে আবিষ্কার করলে ততই তার রক্ত যেন জ'মে যেতে লাগলো; মনে হ'লো, এর পরে সে আর কী যোগ করতে পারে, যে-কোনো ধরনের লেখাতেই যখন অনেকগুলো ক'রে নক্ষত্র জ্বলছে, তখন সে না-লিখলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে ধারণা করতে পারলে না। নিজেই বুঝলে, এই ধরনের চিন্তা কত অর্থহীন; তাই, এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'সাহিত্য'কেই ভুলে থাকার চেষ্টা করলে সে; হঠাৎ ইংরেজি অনার্স ছেড়ে দিয়ে ইকনমিক্স নিলে। তারপর টাটার স্কলারশিপ নিয়ে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স। সেখানে থাকতে-থাকতেই নিজে লেখার সব পরিকল্পনা ত্যাগ করলে; কেননা, সে দেখলে, তা

না-হ'লে যন্ত্রণাভোগ না-ক'রে, হতাশায় ডুবে না-গিয়ে কোনো সাহিত্যের বই সে পড়তেই পারবে না। ফিরে এসে প্রথমে কলকাতায় তারপর দিল্লিতে প্রোফেসরি, তারপর সরকারি চাকরি, যুদ্ধের মধ্যে পুনা, রাওলপিণ্ডি, শিঙাপুর ঘুরে অনেকদিন পর আবার কলকাতা।

প্রফুল্লর এই কথাগুলোর মধ্যে একটুও অহমিকা, অভিমান বা অনুশোচনা প্রকাশ পেলো না; বালক বয়সের কোনো দুর্ঘটনা বা লজ্জার কথা নিয়ে যেমন বয়স্করা হাসিমুখে গল্প করে, তেমনি সহজভাবেই বললে। ততক্ষণে গাড়ি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঢুকেছে; আমার মনে পড়লো সে এই পাড়াতেই থাকে। এক ফাঁকে বললুম, 'আমাকে একটা বাস্-স্টপের কাছে নামিয়ে দিন।'

'আমি পরে নামবো।'

'আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে না!' হঠাৎ একটু বেশি জোরেই ব'লে ফেললুম কথাটা।

'আমার কোনো অসুবিধে নেই।'

'আমি এখানেই নামছি।'

আসল কথা, বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে আমি যেখানে থাকি, সেই রাস্তায়, সেই বাড়ির সামনে প্রফুল্লকে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করছিলো। হ্যাঁ—আমিও এতটাই স্নব! আর লজ্জা করছিলো ব'লে রাগও হচ্ছিলো নিজের উপর: রাগ, অবজ্ঞা, আক্রোশ।

'ঠিকই নেমে যাবেন এখানে?'

তার সৌজন্যের অন্তত একটু মৌখিক প্রতিদান দেবার চেষ্টায় বললুম, 'আপনি আর কতদূর?'

'এই কাছেই।—যদি কিছু মনে না করেন,—বা কোনো অসুবিধে না হয়—আসুন না একবার পাঁচ মিনিটের জন্য।' ব'লে সে আমার

দিকে মুখ ফেরালো, তার চোখে সন্দেহাতীত আগ্রহ দেখলাম। বাড়ি অবধি তাকে যেতে দিলুম না ব'লে মনটা একটু দুর্বল ছিলো সেই মুহূর্তে। কয়েক মিনিট পরে গাড়ি একটা গেট দিয়ে ঢুকলো, সামনে একটা নতুন, শাদা, তেতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি। আমি প্রফুল্লর সঙ্গে গাড়ি থেকে নামলাম।

—কিন্তু এর পরের ঘটনা বলবার আগে অন্য দু-একটা কথা ব'লে নিতে হবে : সেটাই জরুরি, সেটাই আসল। সেই প্রথম দিন তার বাড়ি গিয়েই আমার মধ্যে দুটো ভাব জেগে উঠলো, তার প্রথমটা প্রফুল্লর বিষয়ে। তার ঝকঝকে সাজানো ফ্ল্যাটে যখন তাকে দেখলাম—কোট ছেড়ে, শার্টের গলা খুলে, তালতলার চটি প'রে এসে বসলো সে, আর আমি কান দিয়ে তার কথা শুনলাম আব মাঝে মাঝে চোখ ফেললাম ঘরের চারদিকে—তখন তাকে দেখে-দেখে একটা নতুন উপলব্ধি জেগে উঠলো আমার মনে। কবি থেকে চাকুরেতে পতিত হয়েছে ব'লে আর তাকে করুণা করলাম না : তাব মধ্যে আমি দেখতে পেলাম আমাব ঠিক বিপরীত মানুষ, যা-কিছু আমি নই, যা-কিছু আমাব নেই, তারই সন্নিপাতের নাম প্রফুল্ল রায়। সুখী, শান্ত, শিক্ষিত, সুসংবদ্ধ, আরামে প্রতিষ্ঠিত এবং আরামের যোগ্য ; চেহারায়, চরিত্রে, হৃদয়বৃত্তিতে সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার মতো অনুভূতিশীল আর সুন্দব : প্রফুল্ল রায়। একটা সূক্ষ্ম মেয়েলি গন্ধ বার-বার যেন ভেসে এলো তার গা থেকে : মেয়েদের মতোই গোছালো স্বভাবেব, সব সময় উপস্থিত, একসঙ্গে দুটো তিনটে কাজ করতে সক্ষম। তার সিগারেট ধরানোটাও আমার চেয়ে কত নিপুণ! আমার হাত থেকে সিগারেট প'ড়ে যায়, ছাই ঝরে কাপড়ে, আঙুলের চাপে এক মিনিটেই চেপ্টে যায় ওটা। আর তার আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটি তার সুগোল তারুণ্য শেষ পর্যন্ত অক্ষত রেখে জ্ব'লে যায়। যত তাকে দেখলাম, ততই তার দিকে আমার আকর্ষণ দুর্বার হ'য়ে

উঠলো ; মনে হ'লো ওকে আমার প্রয়োজন, ওকে আমি চাই, ওর সঙ্গে আমার জীবনটা বাঁধা পড়লে এখনো উদ্ধার পাই আমি। আর সেই সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে হিংসার আগুন জ্ব'লে উঠলো আমার মনে, আমার বিদ্বেষ তাকে ধ্বংস করার জন্য লাফিয়ে উঠলো। আতঙ্কে কেঁপে উঠে আমি উপলব্ধি করলাম যে আমি যা হ'তে চেয়েছি, হ'তে পারি না, অথচ এখনো যা হ'তে চাই—সেই অসম্ভবেরই নাম প্রফুল্ল রায়।

এবং দ্বিতীয় কথাটা এই যে তার স্ত্রী অর্চনাকে আমি পাগলের মতো ভালোবেসে ফেললাম। সেই প্রথম দিনেই। চোখে দেখা মাত্র।

সাত

সুন্দর সহজ ক'রে সাজানো ফ্ল্যাট। গোলাপি শেডের তলায় দাঁড়ানো আলো জ্বলছে (শীতের আরম্ভ তখন, আপিশ থেকে ফেরার আগেই আলো জ্ব'লে যায়), মেঝেতে হলুদ আর সবুজে বোনা কার্পেট, আরামে ভরা আসন, দেয়াল জুড়ে বই, দেয়ালের কোণে রেডিওগ্রাম। বেঁটে বুক-শেলফের মাথায় পিকাসোর ছাপা ছবি, নানা দেশের পুতুল। অসাধারণ কিছু নয়, সব 'ভদ্রলোকে'রই এ-রকম বসবার ঘর থাকে, এমন কত হাজার আছে কলকাতায়। কিন্তু প্রফুল্লর ঘরে ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিলো ; সেখানে পা দিয়েই আমি বুঝেছিলাম ওটা শুধু সাজানো জিনিশ নয়, ওটা হ'য়ে উঠেছে দিনের পর দিনের বাঁচায় আর ভালোবাসায়। একটি সুখী পরিবার বাস করে এখানে (সুশ্রী, সুবেশ, ছেলেমেয়ে দুটিকেও দেখলাম), পরস্পরকে ভালোবাসে তারা, তাদের জীবনটাকেই এই ঘরের মধ্যে চেনা যায়।

বোধহয় ভুল বললাম। শুধু ভালোবাসার দ্বারা কিছু হয় না, শক্তি থেকেই সব জন্মায়—শোভনতা নামক তুচ্ছ জিনিশটাও ব্যতিক্রম নয়। একশো টাকা রোজগার-করা দম্পতী, হাজার ভালোবেসেও, কেমন ক'রে তাদের ময়লা কাঁথা লুকোতে পারবে? আর কত অত্যুৎকৃষ্ট ড্রয়িংরুমের পর্দার পিছনে কত হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, কে-ই বা তার খবর রাখে। না—জড় বস্তু তার নিরপেক্ষতা কাটিয়ে উঠতে পারে না কখনো, তার উপর মনের কোনো প্রভাব দেখাটা হাস্যকর। (উদাহরণ : গ্র্যাণ্ড হোটেলের দামি ঘর সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, তাই ব'লে

কি সেটা কম আরামের ?) আর তাছাড়া, এই সব সাজসজ্জা ব্যাপারটাই বাজে, এক রকমের মানসিক ব্যভিচার ; নিজেকে যেন সিকি-আনি-ছুয়ানিতে ভাঙিয়ে খরচ ক'রে ফেলা। আমার মতে (এখনকার মতে) সবচেয়ে পবিত্র আশবাব হ'লো চারটি শাদা দেয়াল, যে-দেয়াল নিজে কিছু বলে না, তাই যাকে আমার কথা দিয়ে ইচ্ছেমতো ভ'রে তুলতে পারি।

কিন্তু সেদিন, সেই সময়ে প্রফুল্লর ঘরটাকে আমি দেখেছিলাম তার আর অর্চনার একটা রচনার মতো। যেন ফাঁকে-ফাঁকে অনেক-কিছু পড়া যায়। তাই আমার অনেক-কিছুই ভালো লাগেনি।

—সত্য কথাটা এই যে আমার মধ্যেও ইতরামো আছে। প্রফুল্ল যে আপিশে আমার উপরিওলা সে-কথাটা ভুলতে পারিনি। যদি সে আমাকে আপিশে কয়েকটা ভদ্র গোছের বুলি শুনিয়ে ছেড়ে দিতো ('বিখ্যাত' লেখকের প্রতি ও-রকম দুর্বলতা থাকে অনেকের), তাহ'লে কোনো মুশকিল ছিলো না, আর ভাবতে হ'তো না তার কথা। কিন্তু আমাকে গাড়িতে তুলে নেয়া, বাড়িতে নিয়ে আসা, তারপর তার আর অর্চনার সুস্পষ্ট অনুরাগ (শুধু আমার লেখার প্রতি অনুরাগবশতই—ব্যক্তিগতভাবে আমার বিষয়ে কিছুই না-জেনে)—এ-সবে আমার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ নানারকম কুটিল সন্দেহে ভ'রে উঠলো। এরা কি পিঠ-চাপড়াতে চাচ্ছে আমার ? উপকার করতে ? আমি কি করুণা করার সুখ দিচ্ছি এদের ? এখন আমার মনে হচ্ছে যে তাদের মতো মানুষ আমি আগে দেখিনি, এমনকি আজ এ-কথাও মানতে পারি যে তাদের মতো কমই দেখা যায় ; কিন্তু তখন আমার কোনো উপায় ছিলো না আত্মরক্ষায় প্রখর হ'য়ে না-উঠে, প্রত্যেকটি সম্ভব উপায়ে নিজের 'চরিত্র' (ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলাম তখন) জাহির না-ক'রে। মনে-মনে

খুব উল্লসিত হলাম আমার জামা-কাপড় প্রতিদিনের চেয়েও ময়লা ব'লে ; ধুলোমাখা কাবলি থেকে আমার মস্ত চাষাড়ে পা দুটোকে বের ক'রে সোফার উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলাম, গোলাপের পাপড়ির মতো পাৎলা চিনেমাটির পেয়ালাটাকে ঠনাৎ ক'রে প্লেটের উপর নামালাম, কেকের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলাম মেঝেতে, ওদের দু-জনের নরম আওয়াজের পর ঘর ভ'রে গমগম ক'রে উঠলো আমার গলা। অবশ্য এই ব্যবহারই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, আর এটাই আমি বরাবর বজায় রেখেছি ওদের সঙ্গে—নিজেকে মুহূর্তের জন্যও 'সাজিয়ে বের' করিনি ; তবু ওরা সহ্য করেছে আমাকে, আর—আর - চুপি-চুপি বলি কথাটা—ভালোবেসেছে। আমি পালাতে চেয়েছি—ঈশ্বর জানেন আমি পালাতে চেয়েছি : ওদের বিতৃষ্ণা উৎপাদনের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। সেই প্রথম দিনেই আশা করেছিলাম প্রফুল্ল আর আমাকে আসতে বলবে না, কিন্তু সে আমাকে পরের শনিবার আবার নিয়ে এলো, আর মাসখানেকের মধ্যে (বোধহয় আমার দুর্বলতা বুঝে) আমার বদলির ব্যবস্থা ক'রে দিলে যুদ্ধেরই অন্য একটা আপিশে। এতে আমার মাইনেও কিছু বাড়লো ; তার জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারিনি। তার সঙ্গে আমার সাংসারিক ব্যবধানটা আরো যেন খুঁচিয়ে উঠলো এতে। তাকে ক্ষমা করতে পারিনি এইজন্যে যে, অন্তত একটা ক্ষেত্রে সে আমার চাইতে 'উঁচু দরের' মানুষ।

—কিন্তু শুধু একটা ক্ষেত্রে ?

আট

হয়তো ছ-মাস, হয়তো চার-পাঁচ মাস ধ'রে আমার জীবন তাদের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ছিলো। যতদিন না সেই ভয়ংকর ঘটলো।

আমার জীবনে এই একটা সময়, যখন আমি খুব বেশি কথা বলেছি। একসঙ্গে এত কথা আগে আমি বলিনি কখনো। সাহিত্যিক আড্ডা-গুলো বিষয়ে আমার আপত্তিটাই এই যে বকবকানির চুলকোনি কেউ সামলাতে পারে না সেখানে। বক্তব্য কিছু নেই : শুধু ব্যায়ামের জন্য, বা ভদ্রতারক্ষার জন্য, বা সময় কাটাবার জন্য কণ্ঠের কসরৎ ক'রে যায়। সুদূরপরাহত এবং কাল্পনিক সম্ভাবনা নিয়ে, নেহাৎই একটা অনুমান অথবা মতবাদঘটিত প্রশ্ন নিয়ে, সুভাষচন্দ্র বসু এই মুহূর্তে বার্লিনে না টোকিওতে না কি ইম্ফলে আছেন, এই ধরনের সমস্যা নিয়ে—তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উত্তেজনায় গলা ফাটাতে শুনেছি। বর্তমান জগতের 'শ্রেষ্ঠ মানব' কে, আধুনিক যুদ্ধে নৌবলের প্রাধান্য কতটা ক'মে গেছে এই 'আন্তর্জাতিক অবস্থা'র মধ্যে 'শিল্পীর কর্তব্য' কী, এই সব বাজে, বাজে, ছেলেমানুষি গবেষণার গাম্ভীর্য দেখে বিতৃষ্ণায় আমার নাড়িভুঁড়ি উল্টে এসেছে। আমি বরাবর মনে-মনে এই নিয়ে গর্ব করেছি যে আমার কোনো 'মতামত' নেই।

কিন্তু প্রফুল্লর ঘরে ব'সে, দিনের পর দিন, আমি দেখলুম আসলে-কিছু-এসে-যায়-না এমন কোনো-কোনো বিষয় নিয়ে আমিও চঞ্চল হ'য়ে উঠতে পারি। প্রফুল্লই করেছে এটা : যেন ভেবে-ভেবে এমন কথা উত্থাপন করেছে, যাতে আমি যোগ দিতে বাধ্য হয়েছি—এমনকি

প্রতিবাদ করতে। বলতে গেলে অনেক তর্ক হ'য়ে গেছে তার সঙ্গে আমার : ঠিক তর্ক নয়, কেননা আমাকে চেতিয়ে তুলেই সে চুপ ক'রে গেছে, চুপ ক'রে শুনেছে সে আর অর্চনা (তাদের ধৈর্যের তারিফ করি, কেননা আমার কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য নয়, উত্তেজনায় রীতিমতো কর্কশ হ'য়ে ওঠে, আর—লেখায় যেমনই হোক, গুছিয়ে আমি কিছুই বলতে পারি না)—হ্যাঁ, অশেষ ধৈর্য ধ'রে শুনেছে ওরা ; যখন খেই হারিয়ে ফেলেছি, অল্প কিছু ব'লে আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ-সব কথাবার্তার একটা বড়ো বিষয় ছিলো—রবীন্দ্রনাথ। প্রফুল্লর মুখে যখন-তখন তাঁর নাম শুনি, তার বলার ধরনেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথকে সে কত বড়ো ব'লে ভাবে ; সে আক্ষেপ করে তাঁর কবিতা তেমন মন দিয়ে কেউ আর পড়ে না ব'লে, ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা নিয়ে বলে যে ধ্যানমগ্ন শুভ্র মহাদেবের বিরাট কল্পনাকে বাঙালি যেমন চড়ক-সংক্রান্তির ভালোমানুষ জামাতা-বাবাজীতে পরিণত করেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কিন্নর-কণ্ঠকেও সভাসমিতি-পাঠ্যবইয়ের হার্মনিয়মের সঙ্গে এমন ক'রে জুড়ে দিয়েছে যে আস্তে-আস্তে তাঁর আসল গলা ভুলেই যাচ্ছে লোকেরা।

আর, অবশ্য, এ-সব কথা শুনে, আমি একদিন বলতে বাধ্য হয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ আমার ভালো লাগে না। তারপর, প্রফুল্লর দৃষ্টির উত্তরে, আরো বলতে হয়েছে।

—ভালো লাগে না (আমি বলেছি) অনেকগুলো সুস্পষ্ট কারণে। এক নম্বর : রবীন্দ্রনাথ বড্ড বেশি ভদ্রলোক ; দুই নম্বর, তিনি ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলেন ; তিন নম্বর, তাঁর লেখায় অনেক কপটতা ছিলো। অনেক বিষয়ে সত্য কথা তিনি বলেননি, নয়তো সত্য বলার ভয়ে বিষয়টাকেই এড়িয়ে গেছেন। তাঁর লেখা সরল, তরল, কোমল, ঐ 'ল' অক্ষরটার মতোই নরম আওয়াজের ; যেহেতু ছন্দ-মিল সহজে

এসেছে, কবিতাগুলোকে অনর্থক বাড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন; লেখাটা যখন ভিতর থেকে ক্লান্ত হ'য়ে গেছে তখনো তিনি গায়ের জোরে চালিয়ে নিয়ে গেছেন বেচারাকে। গায়ের জোর মানে ভাষার জোর। আর জোর মানে ঠিক ক্ষমতাও নয়: টগবগে তেজি কোনো ঘোড়ার পিঠে তিনি চাপেননি; ভাষাটা তাঁর জমিদারির মতো ছিলো, বাংলা ভাষার শব্দগুলো তাঁর অধীনস্থ প্রজার মতো যেন, তিনি আঙুল নাড়ামাত্র একজনের জায়গায় দশজন ছুটে আসে। একজনের জায়গায় দশজন: এই কর্তৃত্বই তাঁর কাল হ'লো। তাঁর যে-কোনো একটা কবিতা নিন না: 'মানস-সুন্দরী' কি 'যেতে নাহি দিব'—অত, অত, অতক্ষণ ধ'রে কী ছিলো বলবার? কেন তিনি ছাঁটাই করতে পারেননি, বাছাই করতে পারেননি—কেন তিনি কবিতাটার নিজের মধ্যে বেগ আনতে পারেননি, কোনো-একটা ধারণাকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছেন শুধু? ধরুন, 'হৃদয় আমার নাচে রে'। কি, 'হে নিরুপমা' কি, এমনকি, 'দে দোল দোল', যেটা তিনি রেকর্ডে অনেক বাদ দিয়ে পড়েছিলেন ব'লেই ভালো লাগে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে যার ভাষার ভারে দম বেরিয়ে যায়। এ-সব কবিতায় শুধু বর্ণনা আছে, কবিতা নেই। বর্ষা এসেছে, তার কয়েকটা উপমা, শুধু কয়েকটা উপমা; এ কি কোনো ভালো কবির যোগ্য কাজ? বর্ষাকে সাজানো হ'লো বটে, কিন্তু বলা হ'লো না। 'হে নিরুপমা···করিয়ো ক্ষমা': এই মিলটা তাঁকে পেয়ে বসলো, নানাভাবে ওটাকে ব্যবহার ক'রে কবিতা শেষ ক'রে দিলেন। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে: তারপর? মেয়েটি কী বললে? প্রেমিকের আবেদন কি মঞ্জুর হ'লো? যদি হ'য়ে থাকে তাতে তার নৈরাশ্য জাগলো, না উৎসাহ? এ-সব কথা জানতে ইচ্ছে করে আমাদের; কিন্তু না, আগে-পিছে কিছুই নেই,

শুধু একটা নান্দীপাঠ হ'লো, কোনো নাটক পেলাম না। গল্পে যেমন আরম্ভ, আর প্রবাহ, আর শেষ, কবিতার মধ্যেও সেই রকম থাকলে তবে তো আমরা সুখ পাবো। শেষ বয়সে তিনি নিজেও বুঝেছিলেন তাঁর দুর্বলতা ; কিন্তু অমিত রায়কে দিয়েও একটা অ-রাবীন্দ্রিক কবিতা তিনি লেখাতে পারেননি।

এমনি, আমি। সেই মুহূর্তের আগে আমি ভাবিওনি যে এত কথা আমার বলবার আছে ; ভাবিনি, রবীন্দ্রনাথ আমি যেটুকু বা পড়েছি তা নিয়ে এতখানি চিন্তা করার সময় কখনো হয়েছিলো আমার। বোধহয় আমার কথাগুলি ভীষণ বেয়াদপির মতোই শুনিয়েছিলো ওদের কানে ; প্রফুল্লর মুখটা একটু বেশি লালচে দেখালো, কিন্তু শান্ত ভঙ্গির কোনো ব্যতিক্রম ঘটলো না।

উত্তরে বেশ কয়েকটা সুনির্বাচিত কথায় সে আমাকে জানিয়ে দিলে যে আমার কথায় কিছু-কিছু আংশিক সত্য থাকলেও গোড়াতেই আমি ভুল করেছি। বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথের জমিদারি ছিলো না, পৈতৃক সম্পত্তি ছিলো না ; ছিলো তাঁর রাজত্ব, তাঁর নিজের উপার্জন। রবীন্দ্রনাথের আগেকার যে-কোনো লেখার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যায়। আর তাঁর লেখাগুলো পর-পর চিন্তা করলে আর সন্দেহ থাকে না। তখন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই যে তিনি এক মহাজনমাত্র নন, শুধু পূর্বপুরুষের ব্যবসাকে সুদে খাটিয়ে বাড়াননি ; তিনি, তাঁর নিজের বলে আর একলার বলে, একটা ছোটো, গ্রাম্য পরগনাকে মহাদেশে পরিণত করেছিলেন ; তিনি অত বেশি না-লিখলে, আর 'অতক্ষণ ধ'রে' না-লিখলে বাংলা ভাষার এত ঐশ্বর্য প্রকাশ পেতো না। সত্য, ঐ জয় বা আবিষ্কার একটা নেশার মতো জুড়ে বসেছিলো তাঁকে, তাতে তাঁর অনেক কবিতার, কবিতা হিশেবে, ক্ষতি

হয়েছে। কিন্তু আরো কত আছে : কত বিচিত্র আর আশ্চর্য উদাহরণ। এক হাজার, দু-হাজার, পাঁচ হাজার লাইন ছেঁটে ফেললেও কোনো ক্ষতি হয় না তাঁর। হয়তো ভালোই হয়। 'ভাববেন না,' মুচকি হেসে আমাব দিকে তাকিয়েছে প্রফুল্ল, 'ভাববেন না আপনার কথাতেই সায় দিচ্ছি। ঐ পাঁচ হাজার লাইন বেশি না-লিখলে তিনি তাঁর কাজটি ঠিক করতে পারতেন না। বাংলা ভাষাব আর সাহিত্যের তখন যা অবস্থা, তাতে ঠিক ঐ রকম লেখারই প্রয়োজন ছিলো, ঐ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"রই মতো। উচ্ছ্বাস আর ঐশ্বর্য এক হ'য়ে গেছে ওখানে। মঙ্গল-কাব্যের মফস্বল থেকে ঐ তো আমাদের মুক্তি। ঐ তো প্রথম রীতি, নীতি, দেশাচার ছাড়িয়ে ব্যক্তির বিজয়-ঘোষণা। কল্পনাও করবেন না যে তাঁর কবিতা লেখা না-হ'লে আপনিও আজ আপনার উপন্যাস লিখতে পারতেন।'

'জানি না। আর সে হ'লো ইতিহাসের কথা। সে-দিক থেকে তিনি খুব মস্ত লেখক হ'তে পারেন ; কিন্তু উপস্থিত আমার কোনো কাজে লাগছেন না তিনি। তাঁকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই।'

'আমাদের প্রয়োজনগুলিও সব সময় এক থাকে না,' এই ব'লে আরম্ভ ক'রে প্রফুল্ল আমাকে লিরিক কবিতার সারমর্ম বুঝিয়েছে। সেটাকে নেবার জন্যেও মনের একরকম আবহাওয়া চাই। কীর্তনে গান আর গল্প মিশে থাকে ; কিন্তু গল্পটাকে বাদ দিয়ে গান যেখানে নিজের পায়েই দাঁড়ায় তারই নাম লিরিক। কাহিনীর আভাস থাকতে পারে, কিন্তু তার উপর কিছু নির্ভর করছে না ; একটা মুহূর্তের অনুভাব, আমাদের মনের উপর দিয়ে যেটা তখনই গড়িয়ে প'ড়ে যায়, সেটাকে যেন জাদুমন্ত্রে ধ'রে ফেলা হ'লো : এ-ই হচ্ছে ব্যাপারটা। 'কৃষ্ণকলি' কবিতা কেন অমন অদ্ভুতভাবে হানা দেয় আমাদের মনে ?

ওতে কিছুই নেই, কোনো 'কথা' বলা হয়নি, কোনো নাটকীয় প্রতিঘাত পাই না ; একটি কালো মেয়ে একটা মাঠের মধ্যে একবার দাঁড়িয়েছিলো, তাতে কী এসে যায় পৃথিবীর ? কিন্তু এসে যায় ব'লে প্রত্যয় জন্মায় তখনকার মতো ; ঐ তুচ্ছ হঠাৎ প্রধান হ'য়ে ওঠে, যাকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাববার মতো কিছু নেই তাকেও আমরা ভুলতে পারি না। এই কাজটি দু-ভাবেই করেছেন তিনি : ছন্দে বেঁধে, আর সুরে বেঁধে। তাঁর গানের কথা ভুললে চলবে না ; হয়তো তাঁর গানই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সেই এক-একটি ছোটো রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিনিশটা কেমন ভিতরে-ভিতরে গোপন চাপে গ'ড়ে উঠেছে ; তাঁর অনেক কবিতায় যা নেই—সেই গতি, ক্ষীণ আয়তন সত্ত্বেও, কাজ ক'রে যাচ্ছে ওখানে, ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে জিনিশটা, অথচ সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যা হ'য়ে উঠেছে তাকে গদ্য ভাষায় তর্জমা করা যাবে না কখনো। অস্পষ্টতা নয়, যেন বড্ড বেশি বলার আছে, অনির্বচনীয়কে ব্যক্ত করতে চায়। এই সবই মনে রাখতে হবে তাঁর বিষয়ে কথা বলতে হ'লে। এবং, যে-বিষয়গুলো তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তিনি আনেননি বা আনতে পারেননি, তা বলবার জন্যেই শেষ বয়সে তাঁকে ছবি আঁকতে হ'লো।

'ওখানেই আমার আরো আপত্তি,' জবাব দিতে দেরি করিনি আমি। তাঁর কবিতা যদি "নিজের পায়েই দাঁড়াতে" পারবে তাহ'লে তিনি কেন গান বেঁধেছিলেন ; কেন, শেষ পর্যন্ত, "কৃষ্ণকলি"র মতো কবিতাতেও সুর বসিয়ে জাত মেরেছিলেন তার ? আবার এদিকে—তাঁর অনেক গানের সুর বাদ দিয়ে দেখুন—তাহ'লে কিছুই থাকে না। সুরের ভেলকিতে বাজে কবিতাকেও ভালো ব'লে চালিয়েছেন তিনি—এটা নিশ্চয়ই কবির যোগ্য কাজ নয়। আর তাঁর ছবির দগদগে লাল রং,

ভাঙাচোরা মানুষের মুখ, দুঃস্বপ্নের মতো জন্তুগুলো—এ-সব তাঁর লেখার মধ্যেই থাকা উচিত ছিলো ; সেখান থেকে পালিয়ে, অন্য একটা পরভাষায় বলতে হ'লো কেন তাঁকে ? তাঁর কাজ ছবি আঁকা ছিলো না : লেখক তিনি। না—আমি এমন কবি চাই যিনি গান বাঁধেন না, ছবি আঁকেন না, তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েই সব বলতে পারেন ; তারই মধ্যে ছবি আঁকেন, যতটা ছবি সহ্য হয় সেখানে ; তারই মধ্যে সুর দেন, ঠিক যেটুকু সুরে কথাগুলো গরম হ'য়ে ওঠে কিন্তু গ'লে গিয়ে চরিত্র হারায় না। আমি চাই—এই ধরুন না আপনারই মতো একজন কবিকে চাই আমি।'

এ-কথা শুনে প্রফুল্ল তার পক্ষে একটু চড়া গলায় হেসে উঠলো।

হেসে উঠলো' বললাম, কিন্তু এতটা কথা একদিনে হয়নি ; অনেক দিনের অনেক কথার সারাংশ লিখলাম এখানে। আর এই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ থেকেই আরো বিষয় উৎপন্ন হয়েছে ; দেখা গেছে তার প্রত্যেকটাতেই প্রফুল্লর আর আমার ঠিক উল্টোউল্টি ধারণা। তার মধ্যে একটা কথা ফিরে-ফিরে এসেছে অনেকবার : লেখকের কোনো বিশ্বাস থাকা উচিত কিনা ; আর, যদি তা-ই হয়, সে-বিশ্বাস কিসে ?

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ, তারপর কয়েকটা (আমার পক্ষে কানে-মাত্র-শোনা) বিদেশী নাম উল্লেখ ক'রে প্রফুল্ল দেখাতে চাইলো যে বিশ্বাস জিনিশটা শিল্পীর মনে (বিশ্রী কথা, শিল্পী !) রেলের এঞ্জিনে বাষ্পের মতো কাজ করে। আস্থা, সে বললে, নিত্য প্রেরণা জোগায়, ক্লান্তি আর জরার সঙ্গে যুদ্ধ করে, পরিশ্রমের সঙ্গে পুরস্কারের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেয়। এই প্রশ্নটা সব সময়েই উঠছে—এই-যে আমি কাজটা করছি, এ কিসের জন্য ? বাড়ির গৃহিণী যেমন নিশ্চিন্তে বলতে পারেন তাঁর স্বামী-সন্তান ভালো থাকবে ব'লেই তিনি অত যত্ন নিয়ে রান্না

করেন, আর্টের বেলায় এ-রকম কোনো জবাব পাওয়া যায় না। ওতে লোকেরা 'উৎসাহিত' হয়, 'আনন্দ' পায়, ওতে তাদের 'মনের স্বাস্থ্য' ভালো থাকে, এই উত্তরগুলো অতিশয় অস্পষ্ট; শরতের আকাশ, বন্ধুর সংসর্গ, সুন্দর নারী বা শিশু—আনন্দের এই সব অসংখ্য উপকরণ থাকতে সেটাকে আবার রচনা করার জন্য পরিশ্রম কেন—বিশেষত যখন জানি যে মানুষের তৈরি কোনো কিছুই প্রাকৃত বস্তুর মতো অব্যর্থ নয়। কিন্তু, কেউ যদি বলতে পারেন, 'আমি একটা সত্যকে পেয়েছি, সেইটেকে প্রকাশ করার জন্যই আমার চেষ্টা,' তাহ'লে, অন্তত নিজের কাছে, তাঁর কাজ সার্থক হ'য়ে ওঠে।

এখন কথা হচ্ছে (প্রফুল্লর কথা আমি সংক্ষেপে লিখছি, তার উদাহরণগুলো বাদ দিয়ে যাই), আস্থার মধ্যেও মাত্রাভেদ আছে কিনা। আমরা কি জিনিশটাকে ছোটো, বড়ো, ভঙ্গুর আর সুদৃঢ় ব'লে ভাগ ক'রে নিতে পারি? পারি বইকি, না-ক'রে উপায় নেই আমাদের—চেষ্টা ক'রেও আমাদের মূল্যবোধ আমরা এড়াতে পারি না। তারকেশ্বরে মানৎ করলে ছেলের অসুখ সেরে যাবে; ইহুদি, বা ব্রাহ্মণ, বা শাদা-রঙের-সোনালি-চুলের মানুষরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব; কোনো-একটা সমাজব্যবস্থার ফলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হ'তে পারে—এগুলোও এক রকমের বিশ্বাস। কিন্তু এ-সব বিশ্বাসে কল্পনার স্বাধীনতা নেই, মানুষের মনকে তা নিয়মাবলীর মধ্যে বেঁধে ফেলে; তাই এর প্রেরণা খুব বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না মানুষকে। আর্টের জন্য বড়ো কোনো বিশ্বাস চাই, যে-বিশ্বাস সারা বিশ্বকে ধারণ করতে পারে। আস্থার পাত্র হিশেবে, সামাজিক উন্নতির চাইতে ভগবানের মহিমা অনেক বেশি কার্যকারী অন্তত এই কারণে, যে শেষেরটি অনেক বেশি কবিত্বময়।

'মানি না,' প্রফুল্লর কথা শেষ হওয়ামাত্র আমি ব'লে উঠেছি, 'আপনার কথা কোনোটাই মানি না আমি। ছবি, কবিতা—এ-সব জিনিশের সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্কই নেই। আপনি দান্তে, মাইকেলেঞ্জেলোর নাম করলেন; মাপ করবেন—তাঁদের বিষয়ে কিছুই জানি না আমি, কিন্তু এ-কথা কি ঠিক নয় যে তাঁদের সময়ে আরো অসংখ্য মানুষ খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলো; আর তো কেউ ও-রকম কাব্য লেখেনি বা মূর্তি গড়েনি। তাঁদেরই ছিলো সেই শক্তি, তাঁরাই করেছেন। আরো কথা এই যে সে-যুগে মেরী-মাতার ছবির বড়ো-বড়ো খদ্দের ছিলো; যেদিন থেকে খদ্দেররা অন্য রকম চাইলেন ছবিও বদলে গেলো। কিন্তু তাই ব'লে আর্টের কি পতন হয়েছে বলবেন? বরং একটা বাঁধা-ধরা বিশ্বাস থেকে মুক্তি পেয়েই ভালো হয়েছে; যে-কোনো কথাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কানুর গীত ব'লে চালাতে হয় না; সব রকম কল্পনাকেই কাজে লাগানো যায়। এই তো আপনার ঘরে পিকাসোর ছবি—এর মধ্যে কোন বিশ্বাস দেখতে পাচ্ছেন আপনি?

'তারপর কথা হচ্ছে—যদি বিশ্বাস ব'লে কিছু মানতেই হয় তার মধ্যে আর দর-দস্তুর চলে না। সব বিশ্বাসেরই সমান দাম। এমন কোনো মানুষ নেই যে তার জীবন ভ'রে কিছু-না-কিছু বিশ্বাস না করেছে, কিন্তু এমন কোনো মানুষই নেই যে জীবন ভ'রে একই জিনিশ বিশ্বাস করেছে। সব মানুষও একরকম বিশ্বাস করে না। বাবা, মা, পুরুৎ, প্রতিমা, জনতার নায়ক, সিনেমার নায়িকা—কিংবা হয়তো আপনারা যাকে বলেন আর্ট—এই সবই এক-এক সময়ে ঈশ্বরের অবতার হ'য়ে ওঠে মানুষের মনে। এর মধ্যে একটাকে বেশি আর-একটাকে কম নম্বর দেবেন কোন হিশেবে? আপনি যাঁদের

নাম করলেন তাঁরা কি ধর্মের অনেক কুসংস্কারেও বিশ্বাস করেননি? তারকেশ্বরে হত্যে-দিয়ে-প'ড়ে-থাকা একজন মায়ের ছবি আঁকলে (যদি সত্যি আঁকার শক্তি থাকে) সেটা উৎকৃষ্ট 'আর্ট' হবার আমি তো কোনো বাধা দেখতে পাই না। আপনি বললেন, কোনো 'সত্যে' বিশ্বাসী হওয়াটাই আসল কথা। আবার বললেন, যাতে কল্পনা খেলা করতে পারে সেটাই 'বড়ো' বিশ্বাস। এ থেকে আমি এই মানে করছি যে সত্যকেই আপনি কল্পনা বলছেন। আর এই কথাটা আমার অবশ্য খুব মনঃপূত হয়। পরম সত্য ব'লে কিছু আছে কিনা আমি জানি না। অন্য কেউ জানে ব'লেও জানি না। ভগবান, মঙ্গল, সৌন্দর্য—সবই মানুষের মন-গড়া। অতএব, ভগবান মঙ্গলময় এই কথাটায় বিশ্বাস করলে যেমন জোর পাওয়া যায়, তেমনি ভগবানের অস্তিত্ব উড়িয়ে, এই পৃথিবীটাকে একটা নিয়মহীন, শৃঙ্খলাহীন নিষ্ঠুরতার মঞ্চ ব'লে ভাবলেই বা উদ্দীপনার অভাব হবে কেন? "কিছু নেই"—এ-কথাটা বলবার গরজেই এমন কবিতা লেখা হ'তে পারে, যাতে আপনিও মুগ্ধ না-হ'য়ে পারবেন না। আমাদের সব বিশ্বাসই যখন আনুমানিক, তখন কেউ অবিশ্বাসেই বিশ্বাস করলে তাকেও মেনে নিতে হবে আপনাকে। কলম্বাস যখন ভারতে পৌঁছবার জন্য পশ্চিম দিকে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন তখন সারা জগতে তিনি একাই বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীটা গোল। পরে তাঁর বিশ্বাসটাকেই সবাই মেনে নিলে। কিন্তু বিজ্ঞানের বাইরে কোনো কথাই ও-রকমভাবে প্রমাণ হয় না। এমন কোনো সম্ভাবনা নেই যে আপনার আমার এই বিপরীত ধারণার মধ্যে কোনো-একটাকে ধ্রুব ব'লে সবাই মেনে নেবে কোনোদিন। অতএব যে যেমন খুশি বিশ্বাস করুক বা না করুক তাতে কিছুই এসে যায় না।'

'যাতে কিছুই এসে যায় না'—প্রফুল্লর চোখে ঈষৎ কৌতুক দেখতে পেয়েছি আমি—'সেটাকে অস্বীকার ক'রেও সময় নষ্ট করবে না কেউ। অবিশ্বাসও এক রকমের স্বীকৃতি।'

এমনি সব কথা হয়েছে প্রফুল্লর সঙ্গে আমার। মনে হচ্ছে তার সঙ্গে দেখা হবার এক মাস বা দেড় মাসের মধ্যেই এ-সব তর্ক খুব জ'মে উঠেছিলো। কথা বেশি বলতাম আমরা দু-জনেই (সবচেয়ে বেশি আমি); অর্চনা বসে থাকতো সে-ঘরে, কখনো উঠে যেতো ছেলেমেয়েদের কাছে, ফিরে এসে বসতো, মাঝে-মাঝে যোগ দিতো আমাদের কথায়, মাঝে-মাঝে চেষ্টা করতো অন্য কিছু হালকা বিষয়ের আমদানি করতে। তার উপস্থিতি প্রতি রোমকূপে অনুভব করেছি আমি ; তার দৃষ্টি অনুভব করেছি মুখের উপর ; কিন্তু আমি যদি তার দিকে তাকিয়েছি ভালো ক'রে তাকে দেখতে পাইনি।

নয়

অর্চনার মুখ আমার ভালো ক'রে মনে পড়ে না। সে কতটা লম্বা, কতটা রোগা বা মোটা, তার গায়ের রং কেমন—সবই আমার কাছে অস্পষ্ট। তার কথা যখন ভাবি সেই ভীষণ রাত্রিটাই ফিরে আসে মনে। তাই তার কথা ভাবি না, ভাবতে চাই না, পারি না, ভাবতে পারিনি এতদিন। কিন্তু এখন—এখন আমি জীবিত মানুষের সংসার থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছি নিজেকে—এখন আর আমার ভয় নেই।

কথাটা এইভাবে বলা যাক যে প্রফুল্লর ঘরে বসবার আর আলোর ব্যবস্থার জন্যই অর্চনাকে আমি ভালো ক'রে দেখতে পাইনি। আলোর বিষয়েও প্রফুল্লর রুচি ছিলো মৃদুতার দিকে (আর আমার সন্ধেবেলা ছাড়া যাওয়া হ'তো না); একটিমাত্র দাঁড়ানো আলো জ্বলতো তার ঘরে, সেই আলোর সবচেয়ে কাছের আসনে সে, আমি তার একটু-মাত্র দূরে (মাঝখানে ছোটো টেবিলে সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি), আর ওপাশে, যেন ইংরিজি 'এল' অক্ষরের অন্য প্রান্তে, খানিকটা আবছায়ার মধ্যে অর্চনা। হয়তো ঠিক বলছি না; হয়তো আমিই সচেষ্টভাবে চোখ সরিয়ে রেখেছি তার দিক থেকে, কিন্তু তখন মনে হ'তো তাকে দেখবার পক্ষে যথেষ্ট আলো নেই, কিংবা হয়তো তাকে দেখার কাজটি এমনই গুরুভার এবং দায়িত্বময় যে সেদিকে মন দিতে গেলে আমি আর একটি কথাও বলতে পারবো না, প্রফুল্লকে এক নিঃসঙ্গতার দ্বীপে পরিত্যাগ করতে হবে। পাৎলা স্যাণ্ডেলের মধ্যে

অর্চনার পা দুটি দেখেছি মাঝে-মাঝে ; যখন চা ঢেলেছে তার বাঁকানো আঙুল, কব্জি থেকে ব্লাউজের হাতার ধার অবধি তার বাহু ; কখনো—চলাফেরার সময়—তার গলার আর বুকের খোলা অংশটুকুর উপরেও চোখ পড়েছে আমার : কিন্তু সবচেয়ে অনাবৃত আর সবচেয়ে দ্রষ্টব্য তার মুখটাকেই আমি এড়িয়ে গেছি। আমার পক্ষে সহজ ছিলো প্রফুল্লকে দেখা (সে আলোর কাছে ব'লেও সহজ) ; তার সুন্দর মুখে, তার শান্ত কপালে আমি নিবিষ্ট হ'য়ে দেখতাম সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সার্থকতার ছবি—অর্চনাকেই দেখতে পেতাম সেখানে।

এখানে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাকে ; আমার মনের ভাব-গুলোকে নির্মলভাবে ধরতে চাই ; যা তখন ভেবেছি, তার সঙ্গে আমার এখনকার ভাবনাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আচ্ছা···ভেবে দেখি। অবশ্য প্রথম কথাটা এই যে প্রফুল্লর মধ্যে একজন বিবাহিত সুখী পুরুষকে আমি দেখেছিলাম, প্রফুল্ল আর অর্চনাকে মিলিয়ে একটি সুখী দম্পতীকে রচনা করেছিলাম আমার মনে, প্রফুল্লর মুখের কমনীয়তায় অর্চনারই উদ্ভাস দেখেছিলাম। আর তারপরেই বুঝতে পেরেছি আমার ভুল ; মনে পড়েছে প্রফুল্লর মুখ ছাত্রবয়সেও ও-রকমই ছিলো ; মনে হয়েছে এদের দু-জনের মধ্যে কেউ যদি কাউকে 'গ'ড়ে নিয়ে' থাকে তাহ'লে প্রফুল্লই বোধহয় অর্চনাকে। কিন্তু তাও যদি হয়—কী চমৎকার মানিয়েছে দু-জনকে ! স্বামীর প্রভাবে সম্পূর্ণ সায় ছিলো অর্চনার (তা-ই ভেবেছি আমি), তার ভাব-ভঙ্গির অনুকরণ ক'রেও সুখ পেয়েছে সে, আর স্ত্রীর মধ্যে নিজেকে দিতে গিঁয়ে প্রফুল্লও নিয়েছে তার কাছ থেকে, পূর্ণ ক'রে তুলেছে তার নিজের ব্যক্তিত্ব। মোটের উপর, ঐ দু-জন মানুষ এমন সংবদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলো আমার চোখে, পরস্পরের এমন অন্তরঙ্গ, যে একজনকে বাদ দিয়ে

আর-একজনকে ভাবতে পারতুম না আমি; যদি অর্চনা, আমাদের খুব উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যেও, নিঃশব্দে উঠে গেছে ঘর থেকে, আমি সেদিকে না-তাকিয়েই তা বুঝতে পেরেছি। আর, ওখানে তার বেশিক্ষণ ব'সে থাকার কোনো সত্যিকার কারণ যদিও ছিলো না, (ও-সব অবাস্তব মতামতের কথা কতক্ষণ ধৈর্য ধ'রে শোনা যায়?) —তবু ঐ আবছায়ার চেয়ারটাতেই সে ব'সে থাকতো রোজ, আর আমিও তার ব'সে থাকাটাই নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম।

কখনো সে কথা বলতো না তাও নয়। একদিন—এটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার—স্বামীর তর্কটাকে নিজের হাতে নিয়ে ব্যাপারটার সে মোড় ফিরিয়ে দিলে। ভালো আর মন্দ নিয়ে কথা হচ্ছিলো সেদিন। কথা হচ্ছিলো, যাকে আমরা 'প্রতিভা' বলি আর যাকে বলি 'ভালো', তাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা; যদি থাকে, তার প্রকৃতি কী রকম। আমি অবশ্য প্রথমেই জোরগলায় বলেছিলাম যে কবিমাত্রেই স্কাউণ্ড্রেল—হ্যাঁ, ঠিক তা-ই; জাগতিক অর্থে, সাংসারিক বিচারে ঐ বিশেষণটি উপার্জন করার বিশেষ যোগ্যতা তাঁদেরই আছে, যাঁরা কবি, শিল্পী বা দার্শনিক হিশেবে অমর নাম রেখে গেছেন। 'ভাববেন না'—চওড়া ক'রে হেসেছিলাম এখানে—'ভাববেন না আমি আমার নিজের কথা ভেবেই এ-কথা বলছি—যেমন আমি বেশি কিছু লিখতে পারিনি, তেমনি কুকর্মেও নিচের কেলাশে আছি এখনো, আর আমাদের এই এখনকার কম-জোরের দেশে অন্যায়গুলো পর্যন্ত কেমন মিনিমুখো বামন আকার ধারণ করে, সিঁড়ির তলার অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে কিলবিল করে যেন—না, আমার কথা আমি ভাবছি না, নিজেকে গণ্যই করি না এর মধ্যে—কিন্তু আপনার মুখে যাঁদের নাম শুনি, কথা শুনি, তাঁদেরই জীবনগুলো একবার ভেবে দেখুন না।

ঐ আপনার ঝকঝকে শেলফে যাঁদের উপন্যাস, কবিতা, ছবির বই সারি-সারি সাজানো আছে, তাঁরা তেমন মানুষ? কেমন দেবতার পায়ে পুজো দিচ্ছে, বলুন তো, সারা পৃথিবী? কেউ উন্মাদ, কেউ মৃগীরোগী, কেউ উপদংশে জর্জর। কেউ নিজের স্ত্রীকে ময়লার মতো ফেলে দিয়েছে, কেউ বা পরের স্ত্রীকে ময়লা করার পর ফেলে দিয়েছে। স্ত্রী বন্ধু, প্রণয়িণী, প্রকাশক—কারো সঙ্গেই জোচ্চোরি করতে বাধেনি এদের—কখনো অচেতন, কখনো বা সচেতন আর সুচিন্তিত জোচ্চোরি। কত ঘরে আগুন দিয়েছে এরা, ধ্বংস করেছে পরিবার, কত নারী আর বালিকার জীবন ছারখার ক'রে দিয়েছে। পাগলামি, মাৎলামি, ব্যভিচার, দায়িত্বজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের অপরিসীম অভাব, সবার উপরে নিজেকেই শুধু সত্য ব'লে জানা এবং বেগতিক বুঝলেই —পলায়ন। এই তো জীবন এই মহোদয়গণের। আর মৃত্যুও তেমনি, সিফিলিসে প'চে, নিজের কান কাটার পর পাগলা-গারদে, নিজের গলায় ক্ষুর বসাবার প্রচণ্ড অট্টহাসিতে।...কিন্তু আপনাকে বলছি কেন এ-সব—' আমি হাত বাড়িয়ে প্রফুল্লর বাক্স থেকে সিগারেট তুলে নিলাম—'আপনি তো সবই জানেন, আমার চেয়ে ঢের বেশি ভালো জানেন আপনি। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে এইজন্যেই "আর্ট" কথাটা শুনলে হাসি পায় আমার—হাসি পায়, আর গা ঘিনঘিন করে। পৃথিবীর সব শিক্ষিত ভদ্রলোক—তাঁরা যে-মানুষকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না, রাস্তায় দেখলে শিউরে উঠবেন—সেই রকমই অন্য একজনকে মাথায় ক'রে রাখবেন তাঁরা, যেহেতু সেই অন্য একজন তুলি কিংবা কলম চালাতে পারে! তামাশাটা ভেবে দেখুন!'

আমি কথা শেষ ক'রে ছোট্ট, জোরালো গলায় হেসে উঠলাম। এখন, এই মুহূর্তে, কথাগুলো কাগজের উপর লেখার পর, আমার

সন্দেহ হচ্ছে যে এ-সব ব'লে আমি প্রফুল্লকেই আঘাত দিতে চেয়েছিলাম, কেননা উল্লিখিত 'শিক্ষিত ভদ্রলোকে'র সে-ই তো উজ্জ্বল প্রতিনিধি। তার আতিথেয়তা ভোগ করতে এসে—বা করছি ব'লেই—তাকেই বিদ্রূপ করা কি লক্ষ্য ছিলো আমার? না কি এই বক্তৃতার দ্বারা আসলে আমি চেয়েছিলাম—তাকে সাবধান ক'রে দিতে, আমারই বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতে? 'আমাকে তুমি বাড়িতে ঢুকতে দিয়ো না, প্রফুল্ল, এখনো আমাকে তাড়িয়ে দাও—' এই কি ছিলো আমার করুণ, উদ্ধত আবেদন?

কিন্তু প্রফুল্ল চুপ ক'রে শুনলো আমার কথা, আমি থামাব পরেও তার মুখে কোনো রঙের বদল দেখলাম না। শুধু একটু কৌতুকের হাসি ফুটলো ঠোঁটের কোণে, যখন সে আমার কথার জবাব দিলে। আমার কথায় সত্য নেই তা নয় (সে বললে), কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি আছে, কতগুলো বাছাই-করা উদাহরণ থেকেই সাধারণ নিয়ম দাঁড় করাচ্ছি আমি। খুঁজলে, উল্টো উদাহরণেরও অভাব হবে না। সুখী, সুস্থির, গার্হস্থ্য জীবন—তার মানেই মনের মৃত্যু নয়, তা থেকেও দামি উপহার অনেক পেয়েছে পৃথিবী। আমি যে-সব উদাহরণ ভাবছি সেগুলো পৃথিবীর একটা অংশের একটা যুগের বিশেষ লক্ষণ: গ্যেটে, স্তাঁদাল, বোদলেয়ার, বায়রন, ভ্যান গ—এঁরা ইওরোপের বিশেষ যুগের বিশেষ কতগুলো লক্ষণে আক্রান্ত; সেই লক্ষণগুলো সামাজিক কারণে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো, আর তারই চরম প্রকোপের নাম বোহিমীয় জীবনপ্রণালী, আর বোদলেয়ার যাকে বলেছেন dandyism—শৌখিনতা, উদাসীনতা, কাজে-না-লাগার গৌরব। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রয়োজন ঘটেছিলো সেই সময়ে—আত্মিক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজন—কিন্তু সেই যুগ কেটে যাবার পর, সব

রকম অবস্থা যখন অনেক বদলে গেছে—তখন আর ছেঁড়া কাপড় আঁকড়ে থাকার মানে হয় না। সেইজন্য সাম্প্রতিক পশ্চিমী লেখকদের মধ্যে (প্রফুল্ল একটু ভাবলো এখানে) বায়রনের মতো 'স্কাউণ্ড্রেল' আর হ'লো না, কিন্তু বায়রনের মতোই পরের যুদ্ধে প্রাণ দেবার গরজ দেখা গেলো। আর তাছাড়া···আমরা যার জন্য এঁদের ভক্তি করি তা এঁদের ব্যভিচার নয়, এঁদের সৃষ্টি। কত কবিতা, ছবি, মূর্তি আমরা পেয়েছি, যা দেখে মানুষকে সত্যিই দেবতা ব'লে ভুল হয়—কিন্তু তাদের স্রষ্টাদের বিষয়ে কিছুই জানি না আমরা, অনেক সময় নামটা পর্যন্ত না। কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? কোনো কাজের মূল্য কি ক'মে গেছে তার জন্য? না কি জীবনের কথা খুঁটে-খুঁটে বের করার যে-রেওয়াজ হয়েছে আজকাল, তাতেই আমরা কাজগুলোকে বেশি ভালোবাসতে শিখেছি? বরং (প্রফুল্ল একটু থামলো), বরং এই জীবনী নিয়ে অত্যন্ত বেশি ঘাঁটাঘাঁটির ফলে এ-রকম একটা ভুল ধারণাও ছড়িয়েছে যে ব্যভিচার থেকেই শিল্পের জন্ম—অর্থাৎ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটালেই সরস্বতীর বর মিলতে দেরি হবে না।

'এ-রকম কোনো ধারণা—বিশ্বাস করুন—আমার নেই,' জবাব দিতে দেরি হ'লো না আমার। 'একটি মন, আর একটি কলম, এই দুয়ের সংযোগের ফলেই লেখা হয়, তা আমি জানি। আর-কিছুরই কথা ওঠে না সেখানে; সে কেমন মানুষ, বিয়ে করেছে কিনা, প্রাসাদে না কুঁড়েঘরে থাকে, অম্বল, অজীর্ণ, পিত্তশূল প্রভৃতি ব্যাধি তার আছে কি নেই—এই সব কথাই সেখানে অবান্তর। আর কিছুই থাকে না, শুধু কাজটাই থাকে। কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই তা-ই বা কেমন ক'রে বলি। যা-ই বলুন না, একজন জীবিত মানুষই তো ছবি আঁকে, কবিতা লেখে—মৃতেরা নয়। কেন

এমন হয় যে একজনের জীবন তাকে কবিতা লেখার দিকে ঠেলে দেয়, আর তারই আশে-পাশে একই সময়ে লক্ষ-লক্ষ জীবিত মানুষ সেই কবিতা পড়তে পর্যন্ত চায় না ?'

'এরই নাম সহজশক্তি, প্রতিভা। সেই শক্তি কোথা থেকে আসে আমরা জানি না। কোনো-কিছুরই আদিহেতু জানি না আমরা।'

'আদিহেতু নিয়ে ভাবনাও নেই আমাদের। আপনি যাকে সহজশক্তি বললেন, ধ'রে নেয়া যাক সেটা ঈশ্বরমশাই দান করলেন,' এই ব'লে আরম্ভ ক'রে আমি এলোমেলো অনেক কথা ব'লে গেলাম। কিন্তু ঈশ্বর তো ধানের গোলা উপহার দেন না (এই হ'লো আমার কথা)—এক টুকরো জমি দিয়ে বলেন, 'চাষ ক'রে খাও।' সেই মেহনতের তাগিদ জোটে কোথা থেকে ? সেই এক টুকরো জমি—অনেক সময় ছোট্ট জমি—তাই আঁকড়ে প'ড়ে থাকার অস্বাভাবিক ইচ্ছেটা মরে না কেন ? পৃথিবীতে কত আরামের কাজ, বড়ো-বড়ো কাজ করবার আছে। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজদূত, নিদেনপক্ষে মোটা বেতনভোগী কর্মহীন সৈনিক, নিদেনপক্ষে আপিশের বড়ো সাহেব, নিদেনপক্ষে পান-চিবোনো, দিনে-ঘুমোনো, তাস-পেটানো মধুর গার্হস্থ্য। এ-সবের বদলে, বা এগুলোকে আমল না-দিয়ে—একটামাত্র ঘরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে, পৃথিবীর বিচিত্র আহ্বান উপেক্ষা ক'রে, একটানা একঘেয়ে, অকৃতজ্ঞ খাটুনি কোন মোহে খেটে যায় কোনো-কোনো মানুষ—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ? এবং সেই খাটুনির যা ফল, তার দিকে ঠিক এই মুহূর্তে বেশি কেউ তাকিয়ে দেখবে না, তা জানতে পেরেও সে কাজ থামায় না, এই আশ্চর্য ঘটনারই বা কারণ কী ?

'এর উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করবো,' নরম আওয়াজে কথা বললো

প্রফুল্ল। 'দুটো জিনিশ কাজ করে মনের মধ্যে : অর্থের লোভ অথবা প্রয়োজন, আর যশের আকাঙ্ক্ষা। অনেক বড়ো কাজেরই পিছনে ছিলো হাঁড়ি চড়াবার তাগিদ বা চড়া দামে বেচে দেবার সুযোগ। সকলেই যে বেঁচে থাকতে উপেক্ষা পেয়েছেন তাও তো নয় ; অনেকের বেশ পসারও হয়েছে। যাঁদের হয়নি তাঁরা চেয়েছেন উত্তরকালের কাছে সম্মান—অর্থাৎ অমরতা—সেটা পাবেন ব'লেও মনে-মনে জেনেছেন হয়তো, উদাস পৃথিবীর উপর এমনি ক'রেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। এর একটাকেও মহৎ উদ্দেশ্য বলা যায় না—বরং বলা যায়, যে-কারণে সুদখোর টাকা খাটায় সেই কারণেই কবি তাঁর কবিতা লেখেন। শেষের কথাটা বলেছেন হাল আমলের এক জর্মন দার্শনিক। লাভের আশায় ছাড়া কেউ কোনো কাজ করে না পৃথিবীতে—সেই লাভের চেহারা যেমনই হোক না। সাংসারিক সুখটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন যাঁরা, তাঁরা চান মৃত্যুর পরে অমরতা ; অস্তিত্ব সুদ্ধু বিকিয়ে দিয়ে নিজের দেহচ্যুত তুচ্ছ নামটাকে এতই ভালোবাসেন তাঁরা। অর্থাৎ, নিজেকে অত্যন্ত বেশি ভালো না-বাসলে, অত্যন্ত বেশি দাম্ভিক আর স্বার্থপর না-হ'লে, সত্যিকার শিল্পী হওয়া যায় না।'

'কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের জন্য সব ছেড়েছেন'—হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরোলো—'তাঁদেরও কি তা-ই বলবেন আপনি ?'

'শিল্পীরা যা হ'তে চান,' জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি হ'লো না প্রফুল্লর, 'কিন্তু পুরোপুরি কখনোই হ'তে পারেন না, সন্ন্যাসীরা তা-ই। বুদ্ধ স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন, সেটা শিল্পীর পক্ষে সম্ভবপর, কিন্তু কোনো মারকন্যার দ্বারা আক্রান্ত হ'লে শিল্পীর কী অবস্থা হ'তো, অজন্তার ছবিতেই তার প্রমাণ র'য়ে গেছে। সেই মোহিনীর প্রতি বুদ্ধ যতই উদাসীন থাকুন, শিল্পী তার প্রেমে না-পড়লে অমন রূপের সৃষ্টি

হ'তো না। আঁদ্রে জীদ ঠিকই বলেছেন, শিল্পী হ'তে হ'লে শয়তানের পরামর্শ চাই।'

'কী বললেন? শয়তানের পরামর্শ?'—উৎসাহে আমার গলার আওয়াজ নিজের কানেই কর্কশ শোনালো—'খুব ভালো বলেছে তো কথাটা—চমৎকার! ঠিক!—শয়তান!—যে-শক্তি একটা মানুষকে এক দণ্ডের জন্য শান্তি দেয় না, ঝুঁটিতে ধ'রে দিগ্বিদিকে নাচিয়ে বেড়ায়, তাকে শয়তান ছাড়া আর কী বলা যায়? তাহ'লে এই বোঝা গেলো—আমার আগের কথাতেই ফিরে আসছি আমি—যে শিল্পী মানেই স্কাউণ্ড্রেল, সাংসারিক অর্থে, সামাজিক অর্থে স্কাউণ্ড্রেল। আপনি বললেন পশ্চিমী দেশের উচ্ছৃঙ্খলতার কতগুলো ঐতিহাসিক কারণ ছিলো, এখন সে-যুগ কেটে গেছে—আমি তা জানি না, আমি পুঁথিপত্র পড়িনি—কিন্তু এটা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাই যে শিল্পী কখনো "ভদ্রলোক" হ'তে পারে না, আকারে-প্রকারে চলনসই বা নিখুঁত অভিনয় করলেও মনটা বুড়ো বয়স পর্যন্ত দগদগে কাঁচা থেকে যায়। সে যদি ইস্ত্রি-করা জামা পরে, পরিপাটি চুল আঁচড়ায়, যোগ্য চাকুরে হ'য়ে বেতনবৃদ্ধির ধাপে-ধাপে উন্নীত হয়, যদি—এমনকি স্বামী, পিতা নাগরিক প্রভৃতি পার্টে অনার্স নিয়েও পাশ ক'রে যায় সে—আমি মানছি এর কোনোটাই অসম্ভব নয়—তবু বুঝে নিতে হবে এগুলো সবই তার ছদ্মবেশ, তার নিপুণ অভিনয়—এক প্রতিকূল, ক্ষমাহীন, পরিব্যাপ্ত জগতের মধ্যে তার নিজের সত্তা টিঁকিয়ে রাখার জন্য একটা নতুনতর কৌশল মাত্র। হয়তো কৌশল হিশেবে ব্যভিচারের চেয়ে আরো বেশি কার্যকরী এটা—আধুনিক কবিদের কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতার মতো—লোকেরা ঠিক ধরতে পারে না ব্যাপারটা কী, পার্টিতে দেখা হ'লে তাদেরই একজন ব'লে ভুল করতে পারেও

বা, মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে কিছু সময়, কিছু উত্তমও বাঁচানো যায়। কিন্তু সেই ভদ্রবেশী মানুষটির রচনা—তার সঙ্গে তার আপাতনির্দোষ জীবনযাপনের মিল কোথায়—সেই রচনাকে হ'তেই হবে সমাজবিরোধী, সংসারবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী—অন্তত সে-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন; ঐ সব বৃহৎ, হিতকর প্রতিষ্ঠান, যার আশ্রয়ে মানুষ খেয়ে-প'রে ঘর বেঁধে ছানাপোনা পুষে বেঁচে থাকে, আর বংশানুক্রমে মাছির মতো জন্মায় আর জন্ম দেয় আর ম'রে যায়—তার সঙ্গে —এই আপনি যাকে "আর্ট" বলেন, তার কোথায় কী সম্বন্ধ আছে বলুন তো? ডাইনি-পুরুৎ মন্তর-তন্তরের দিন কবে শেষ হ'য়ে গেছে—মানুষের সমস্ত জীবনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছে বিজ্ঞান—তবু আর্ট কেন? কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না যে খুব ভালো কবিতা লিখে একটি কণা শস্য জন্মানো যায়, কখনোই দেখাতে পারবেন না যে "ফসল বাড়াও" প্রপ্যাগাণ্ডার জন্য কোনো সরকারি মাইনে-করা কবি ভালো কবিতা লিখেছেন। হয় কবিতা হয়নি, নয় কাজ হয়নি। তাহ'লে—এই যে কতগুলো লোক ঘরে ব'সে-ব'সে ছবি আঁকছে বা কবিতা লিখছে—যাদের নিয়ে মাতামাতি ক'রে আমরা কয়েকজন দেশের উন্নতির চেষ্টা করতে ভুলে যাচ্ছি—সেই লোকগুলোকে খারাপ ছাড়া আর কী বলা যায়, শুধু অকেজো নয়, রীতিমতো খারাপ, যাকে বলে evil—এই দেখুন না, "evil" কথাটার কোনো প্রতিশব্দ নেই, এমনি মিনমিনে আমাদের ভাষা।'

ঝোঁকের মাথায় কথা বলছিলাম, একসঙ্গে এত কথা আগে কখনো বলিনি, তবু ফাঁকে-ফাঁকে মনে হচ্ছিলো দূর থেকে কেউ আমাকে দেখছে। দূর থেকে, অন্ধকারের ভিতর থেকে এক জোড়া চোখ। এক কালো অথচ স্বচ্ছ পরদার আড়াল থেকে। মুহূর্তের জন্য অস্বস্তি

বোধ করলাম, কিন্তু চোখের সামনে প্রফুল্লর স্নিগ্ধ মুখশ্রী ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার দিকে তাকিয়ে আমার শেষ কথাটার জবাব দিলে। বললে, 'আমাদের ভাষায় 'evil' কথাটার প্রতিশব্দ নেই, কেননা ভারতীয় হিন্দু evil-এর অস্তিত্বটাই স্বীকার করেনি। কথাটাকে তাঁরা 'না' দিয়ে বলেছেন : অশিব, অমঙ্গল, ইত্যাদি। তার মানে—ভালোই সব, খারাপটা অভাবমাত্র। 'দেখুন না আমাদের "সৎ" কথাটা ; যা আছে তা-ই সৎ, আবার সৎ মানেই ভালো, এবং সত্যের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ রয়েছে।'

কথাটা শোনামাত্র আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেলো। মনে হ'লো, জীবনের আসল দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য খুব দুর্বল আর অক্ষম গোছের কারসাজি এটা। আর এটার উপরেই নির্ভব ক'রে মহাভাবত লেখা হয়েছিলো এ-কথা মেনে নিতেও আমার প্রবৃত্তি হ'লো না। 'তাহ'লে—' আমি বললাম—'তাহ'লে শিবের সঙ্গী ভূত প্রেত পিশাচ কেন? আর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কেন জুয়ো খেলে দ্রৌপদীকে সুদ্ধ বিকিয়ে দেন? কেন কৃষ্ণ—যিনি স্বয়ং ভগবান—তাঁকে জানোয়ারের মতো ব্যাধের তীরে মরতে হয়? দেবতাদের নিজেদের মধ্যে এত বিরোধ কেন? আর কেনই বা অর্জুনের কানে আঠারো সর্গ গীতা জপানো হ'লো—যাতে সে মারতে পারে, মানুষ মারতে পারে?'

'এই কথাটা বোঝাবার জন্য যে দেহ নিয়ে জন্মালে সবই করতে হয়, ভালো-মন্দ কোনোটা থেকেই নিস্তার নেই। জীবনের মরণশীলতা বোঝাবার জন্য। কিন্তু ঐ মরণশীল ক্ষণিকের বাইরে চিরন্তনের ধারণাটাও ছিলো।'

'দয়া ক'রে "অমৃতের পুত্র" বুলিটা আর আওড়াবেন না।' আমি

হাত তুলে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে—'অনেক, অনেক হয়েছে—আর চাই না শুনতে! কে বলেছে, অমৃতের পুত্র? কে বলেছে একপাল বলির পাঁঠা নয়?' কথাটা ব'লেই মনে হ'লো সেই দূরের চোখ তীক্ষ্ণ হ'য়ে বিদ্ধ করেছে আমাকে, মাঝখানকার পরদাটা শুধু স্বচ্ছ নয়, আমিও যেন স্বচ্ছ হ'য়ে গেছি সেই চোখের সামনে। একটু থেমে, একবার ঢোঁক গিলে, জোর ক'রে কথার তোড় চালিয়ে গেলাম, মনে হ'লো এমনি ক'রেই পরদা ছিঁড়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারবো। '"অন্ধকারের পরপারে সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে আমি দেখেছি"—কে দেখেছে? প্রমাণ কী তার? কেউ একজন এ-কথাটা ব'লে গেছে ব'লেই তো সেটা অভ্রান্ত হ'লো না। আমার অবাক লাগে ভাবতে যে এত বড়ো একটা ফাঁকি যুগ-যুগ ধ'রে চ'লে আসছে—আর আপনাদের রবীন্দ্রনাথ তারই চর্বিতচর্বণ ক'রে গেছেন!'

'একেবারে ফাঁকি হ'লে যুগ-যুগ ধ'রে চলতো না। তেষ্টা পায় মানুষের, সেই তৃষ্ণাতেই প্রমাণ। আপনারও আছে তৃষ্ণা, তা না-হ'লে আপনিও এত কথা বলবেন কেন?'

কথাটা শুনে আঘাত লাগলো আমার, মোটা গলায় হেসে উঠলাম। —'আপনার কথার অর্থ এই রকম দাঁড়ায় যে মানুষ যেহেতু ভূতের ভয় করে সেইজন্য ভূত নিশ্চয়ই আছে। আগে ভয় পেয়ে, সেই ভয়ের তাড়ায় অনেকে তো ভূতও দেখে ফেলে। তেমনি কোনো নেশা বা মৃগীরোগের ঝোঁকে হঠাৎ একজন আদিত্যবর্ণ পুরুষকে দেখে ফেলতেই বা দোষ কী। দেখাটা অবশ্য ভাবার্থে বলছি। মনটাকে ঠিকমতো গাঁজিয়ে তুলতে পারলে একটা বীভৎস কালীমূর্তির মধ্যেও পরম ব্রহ্মকে দেখা যায়। মানে—আমি বলতে চাই—ও সব তৃষ্ণা-টৃষ্ণা কিছু নয় —সবই নেশার তেষ্টা আসলে—হোক শ্যাম্পেন, হোক পচাই—মানে,

সেই হান্স আণ্ডেরসেনের রাজার পোশাকের গল্প আরকি—কেউ বোকা বনবে না—আর সেইজন্যেই—’

কথার খেই হারিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম আমি। আমার অস্বস্তি চরমে উঠেছে ততক্ষণে ; সেই চোখ যেন নিঃশব্দে শোষণ ক’রে নিচ্ছে আমার কথা, সেই সঙ্গে আমাকেও, নিঃশব্দ, নিষ্পলক চোখ, তার কাছে কী আমি বলতে চাই তা আমি জানি না। মুহূর্তের জন্য ঘরটা যেন অস্বাভাবিকরকম স্তব্ধ হ’য়ে গেলো, আমি দেখলাম প্রফুল্লর ঠোঁট ন’ড়ে উঠলো, কিন্তু কোনো কথা বেরোতে পারার আগেই ঘরের অন্য দিক থেকে ভেসে এলো অন্য গলায় খুব নিরীহ, ছোট্ট একটা প্রশ্ন :

‘—আপনি গান ভালোবাসেন ?’

সেই গলার আওয়াজে একটা বিদ্যুতের স্রোত ব’য়ে গেলো আমার শরীরে, রোমাঞ্চিত হ’য়ে কেঁপে উঠলাম। ঘরের কম-আলোর অংশে চোখ ফেললাম এবার, ঝ’রে-পড়া শাড়ির আঁচল দেখলাম, গালের ডৌল, শান্ত কপাল, কিন্তু চোখের কাছাকাছি চোখ নিয়ে যেতে সাহস হ’লো না। হঠাৎ খেয়াল হ’লো, আমি এখনো দাঁড়িয়েই আছি। ব’সে, নিজেকে সামলে নিয়ে, কেমন ক্লান্ত, ভারি গলায় বললাম, ‘না, আমি গান ভালোবাসি না।’

‘শুনতে ভালো লাগে না ?’

‘লাগে—যদি দূর থেকে হঠাৎ ভেসে আসে। ব’সে শোনার ধৈর্য থাকে না।’

‘আচ্ছা, একটা গান শুনুন। একটা রেকর্ড—অল্পক্ষণই লাগবে—কেমন লাগে বলবেন।’

অর্চনা উঠে গেলো রেডিওগ্রামের কাছে। আমি হঠাৎ বললাম, ‘আপনি থাকতে রেকর্ড শুনবো কেন।’

'আমি তো গাইতে পারি না।'

'গাইতে পারেন না এমন কোনো মহিলা আজকাল আছেন নাকি বাংলাদেশে?'

বেশ অভদ্র শোনালো আমার কথাটা, প্রফুল্লর মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়া প'ড়ে তখনই মিলিয়ে গেলো। অর্চনা বললে, 'মহিলাদের বিষয়ে আপনার বেশ উঁচু ধারণা দেখছি। কিন্তু আমি গাইতে পারলেও আপনাকে শোনাতুম না।'

'কেন? আপনার গান শুনে হয়তো গান বিষয়েই মত বদলে যেতো আমার। যেমন, আপনাকে দেখার পর, মহিলাদের বিষয়ে আমার ধারণা বদলে গেছে।'

ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু অর্চনা যেন কেঁপে উঠলো মুহূর্তের জন্য—বিতৃষ্ণায় কেঁপে উঠলো। পিঠের উপর লাল রঙের শাল তুলে দিয়ে সে তার মনোমতো রেকর্ডটি বেছে নিলে। 'দেখুন তো—এ-গানটা শুনতে পারেন কিনা। অবশ্য রেকর্ডের প্রাণ নেই—আপনি না-শুনলেও সে কিছু মনে করবে না—এটা মস্ত সুবিধে।' রেকর্ড চললো: 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক, তবে তা-ই হোক—' এই গান শুনলাম গ্রামোফোনে।

'শুনলাম' কথাটা এক আঁচড়ে লেখা হ'য়ে গেলো, কিন্তু আসলে ঐ শোনার কাজটি বেশ জটিল হ'য়ে উঠেছিলো আমার পক্ষে। প্রথমতম আরম্ভেই যেন ধাক্কা দিয়ে একটা দরজা খুলে দিলে বুকের মধ্যে। তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো আমার অনুভূতিগুলো, প্রায় অসহ্যরকম তীক্ষ্ণ; প্রতিটি ছোটো-ছোটো শব্দের চেতনা আমার মনে বহুগুণ বর্ধিত হ'য়ে অনেকক্ষণ ধ'রে চলতে লাগলো—স্লো মোশন ফিল্মে যেমন আমরা ঘোড়ার একবারের পা তোলার ছবিটাই এক মিনিট ধ'রে দেখি—

গানটার সম্পূর্ণ আবেদন নির্দয়ভাবে আছাড় মারলো আমাকে, অথই জল থেকে মুখ তোলা মাত্র আবার যদি কেউ ডুবিয়ে দেয় তখন যেমন দম ফেটে যায়, তেমনি মনে হ'লো আমার যখন কথাগুলো ঘুরে-ঘুরে ফিরে এলো—সেই আড়াই বা তিন মিনিট সময় যেন অন্তহীন হ'য়ে উঠলো আমার কাছে। আমি বুঝতে পারলাম গানটা একটা ইচ্ছে মাত্র—বা একটা প্রার্থনা—আর প্রার্থনার কোনোই মূল্য নেই—কেউ বলছেন ব'লেই দুঃখের মধ্যে মঙ্গল-আলোক জ্বলবে না—কোনো কথাই বলা হয়নি ওতে; বুঝতে পারলাম কবিতা হিশেবে রচনাটা কত দুর্বল আর মামুলি, মনে-মনে বললাম, 'এই রকম কবিতা লিখতে রবীন্দ্রবাবুর আত্মসম্মানেই আঘাত লাগা উচিত ছিলো'—কিন্তু কিছুতেই পারলাম না সুরের সেই অসার, গম্ভীর একঘেয়েমি থেকে কান কিংবা মন সরিয়ে নিতে। আমাকে ক্লান্ত ক'রে দিয়ে তবে শেষ হ'লো গানটা, আমার মনে হ'লো মস্ত একটা কুস্তি ক'রে উঠলাম, আর সেই কুস্তিতে প্রতিপক্ষ আমাকে অন্যায়ভাবে কোমরের নিচে মেরে দিয়েছে। হ্যাঁ, অন্যায়—আজও আমি বলবো সে-কথা—এই রকম গান মানেই জুলুম, জবরদস্তি, অন্যায়, যাকে বলে হাতে-পায়ে বেঁধে পিটোনো।

এই গানে এক নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ; অর্চনার জগতে সেই আমার প্রবেশিকা। প্রফুল্লর জগৎটা, নৈর্ব্যক্তিক ব'লেই, আমার পক্ষে আরামের ছিলো; কিন্তু অর্চনা আমাকে আস্তে-আস্তে যেখানে নিয়ে এলো (কিংবা আমি আনীত হ'তে রাজি হলাম), সেখানে জীবন নামক বর্বর ব্যাপারটাকে ভুলে থাকা যায় না। তাতে অবশ্য আমার মনে বিরুদ্ধ ভাবই জেগে উঠলো প্রথমে—কেননা আমার জীবনটা কিছু প্রীতিকর পদার্থ নয়—কিন্তু এই ভাবে অর্চনার জীবনেও অংশ নেবার অধিকার পেলাম আমি, ওদের দু-জনের যৌথ জীবনেও। কথাবার্তার

ধরন বদলে গেলো ; প্রফুল্ল আর আমি, নানারকম তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে, যে-সব এলোপাথাড়ি কথা বলেছি এতদিন, তার বদলে দেখা দিতে লাগলো ঘরোয়া আলাপ, লোকে যাকে বলে 'গল্প করা', সেই সব খুঁটিনাটি তুচ্ছতার বিনিময়, যার ব্যবহারে উপন্যাসের চরিত্র জীবন্ত হ'য়ে ওঠে আর বাস্তবের মানুষ হৃদয়ে স্থান পায়। সেই একটা সময়, যখন আত্মার উপর দেহের জয় ঘোষিত হয়েছিলো আমার কাছে, মূর্তের কাছে অমূর্তের, প্রাণের কাছে মনের পরাভব ; যখন আমি বুঝেছিলাম একজন মানুষের সাহিত্যিক বা আধ্যাত্মিক রুচির ঘনিষ্ঠ হ'য়েও আমরা সত্যিকার অর্থে ততটা তাকে পাই না, যতটা পাই অন্য একজন মানুষকে তার জীবনের খুব ছোটো একটা তথ্য জানলে। একদিন অন্য কী-একটা কথার সূত্রে প্রকাশ পেলো যে অর্চনা ছেলেবেলায় একবার নারানগঞ্জে ছিলো। এই খবরটা অদ্ভুতভাবে নাড়া দিলো আমার মনে—আমি তাতে নিজেই অবাক হলাম—পাটের গুদোম আর রেলের এঞ্জিনে ভরতি নোংরা নারানগঞ্জ, সেই শহরটার প্রতি হঠাৎ একটা প্রবল ঔৎসুক্য অনুভব করলাম আমি ; তার বিষয়ে আমার সব চাপা-পড়া স্মৃতিগুলোকে হাৎড়ে-হাৎড়ে টেনে তুললাম মনের সামনে ; দেখতে পেলাম এমন কিছু খারাপ ছিলো না জায়গাটা, শীতললক্ষ্যায় সিঁড়ি-নেমে-আসা মজার বাড়িও ছিলো দু-একটা, আর অদ্ভুত একটা রাস্তা, যাতে ঝাউয়ের ডাল শোঁ-শোঁ করে সারাদিন। খুঁটে-খুঁটে অনেক কথা জিগেস করলাম তাকে ; কোন বছরে ছিলো, বাসা ছিলো কোন পাড়ায়, কতদিন ছিলো সেখানে। ভালো মনে পড়ে না—তবে প্রথম যুদ্ধ শেষ হ'লো সেবার, ছেলেমেয়েদের স্কুলে খুব কমলালেবু খাওয়ানো হচ্ছে, তার বাবা সেখানে এস. ডি. ও. ছিলেন, তার বয়স তখন বছর ছয়েক। যুদ্ধ শেষ হয়েছে? শীতকাল? আমিও একবার নারানগঞ্জে

গিয়েছিলাম তখন—ঠিক সেই সময়েই—আমার বয়স তখন এগারো কি বারো, আমার এক পিসির বাড়িতে মাসখানেক ছিলাম। এই যে ঘটনাটা—অর্চনা আর আমি যে ছেলেবেলায় একই সময়ে একই শহরে ছিলাম কিছুদিন—হয়তো পরস্পরকে চোখেও দেখেছি, রাস্তায় গা ঘেঁষেও গিয়েছি কখনো, শুনেছি একই স্টিমারের ভেঁপু আর ট্রেনের গুমগুম আওয়াজ—এই এতদিন পর্যন্ত একেবারেই অজ্ঞাত ঘটনাটায় যেন জীবনের একটা হারানো রত্নকে মুঠোর মধ্যে ফিরে পেলাম আমি।

এই তার কথা বলার ছাঁচ; খুব সহজেই জীবনের গল্প উঠে আসে তার মুখে; রাওলপিণ্ডি শহরটার হয়তো বর্ণনা দিলে একদিন, তার এক পাগলাটে দাশু-মামার কাহিনী শোনালে, দু-দিনের জন্যও কোথাও যেতে হ'লে সঙ্গে নেবার বই বাছাই করতে প্রফুল্ল কতটা সময় খরচ করে তা-ই নিয়েই বললে খানিকক্ষণ। অন্য নানা কথার ফাঁকে-ফাঁকে এগুলো যেন আলগোছে বোনা হ'য়ে যায়· তার গলায় দোলা দেয় কৌতুক আর অবসর; তার বসার জায়গা বদল করে না, স'রে আসে না ছায়া থেকে স্পষ্টতায় (কিংবা আমার চোখই সেটা নিতে পারে না হয়তো)—কিন্তু কান দিয়ে তার কণ্ঠস্বর শুনে-শুনে আমার মনে হ'তে থাকে আমার আর-কোনো কাজ নেই, ভাবনা নেই, ক্লান্তিও নেই—একটা শুভ্র, সজাগ বিশ্রামের মধ্যে মিশে আছি যেন। যখন প্রফুল্লর কথা কিছু বলে তখনই সবচেয়ে ভালো লাগে শুনতে (প্রফুল্ল চোখ তুলে তাকায়, নরম ক'রে হাসে, তাকে বলতে দেয়); বইয়ের দিকে তার দুরন্ত ঝোঁক (বাথরুমেও একটা বইয়ের শেলফ রাখা চাই তার), শুধু নিজেই পড়বে না, অন্যকেও না-পড়িয়ে তার শান্তি নেই, দিল্লিতে এক-একজন ভালোমানুষ ভদ্রলোককে অস্থির ক'রে তুলেছে; যদি

সে নিজে এখনো লিখতো তাহ'লে বিষয়টার দিকে এমন অস্বাভাবিক আকর্ষণ হয়তো থাকতো না, সত্যি তার আবার লেখা উচিত। আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে (এ-ই হ'লো অর্চনার মত) প্রফুল্ল একজন কথা বলার মতো মানুষ পেয়েছে এতদিনে।

'কিন্তু কথা বলার মানুষের অভাব কী—আপনি থাকতে ?'

'"মানুষে"র মধ্যে ঘরের লোককে ধরতে নেই।

'ওটা হ'লো বিনয়ের কথা। বা নিয়মের কথা।'

'আমি তো নিয়মটা এই রকমই জানি যে সব চাহিদা এক জায়গায় মেটে না,' ব'লে অর্চনা তার স্বামীর মুখে চোখ রাখলো মুহূর্তের জন্য। তার সেই দৃষ্টিতে, আর তার মুখের প্রত্যেকটি কথায় আমি বুঝেছি স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা আর অনুরাগ কত গভীর। নিজেকে সে এমনকি একটু আড়ালেই রাখতে চায়, যাতে প্রফুল্লর মনের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত না ঘটে কখনো। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখতে পেয়েছি যে তার অনুরাগের মধ্যে অনেকখানি আছে স্নেহ। আর এতেই আমি গোপন একটা সুখ পেয়েছি, কেমন একটা আশা মনের মধ্যে : ভেবেছি, যে-মেয়ে তার স্বামীকে স্নেহ করে, সে কখনো সত্যি-সত্যি তৃপ্ত হ'তে পারে কি ?

এ-সব কথার প্রতিদানে, আমার দিক থেকে, আমি অবশ্য কিছুই বলতে পারিনি। আমার পক্ষে আমার বাবার কথা বলা অসম্ভব, মা-র কথা বলা অসম্ভব, স্ত্রীর কথা বলা অসম্ভব। এই শেষের প্রসঙ্গটা নিয়ে একটু মুশকিল হয়েছে প্রথম দিকে। তারা আমাকে সস্ত্রীক আসবার জন্য অনেকবার বলেছে (কেননা ভব্য সমাজে সেটাই নিয়ম), আমি নানা ছুতোয় এড়িয়ে গেছি। অবশেষে একদিন বলতে বাধ্য হলাম, 'যদি আমারই জন্য আমাকে চান তাহ'লেই আমি আসতে পারি।'

হেসে বলেছিলাম—কিন্তু ও-কথার মানে কে না বোঝে। দু-জনে একটু চুপ ক'রে থাকলো কথাটা শুনে, আমার দিকে বা পরস্পরের দিকে তাকালো না, তারপর প্রফুল্ল অন্য কথা পাড়লো। তারপর থেকে আমার স্ত্রীর বিষয়ে আর কোনো উল্লেখ করেনি তারা। আমি আরো ঘন-ঘন যেতে লাগলাম, এবং আরো স্বচ্ছন্দভাবে।

এই দু-তিন মাস সময়—প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হবার পর প্রথম কিছুদিন—আমার জীবনে এটাকে সব চেয়ে 'সুখের' ব'লে ধবা যেতে পারে। এই একটুখানি ক্ষণস্থায়ী বিবতি আমাব—যখন আমি যন্ত্রণাভোগ না-ক'রেও ভালোবেসেছি। ভালোবেসেছি প্রফুল্লকে, আর অর্চনাকে। এমনকি তাদের পরস্পরের ভালোবাসাকেও ভালোবেসেছি। এত কাছাকাছি এলাম তিনজনে যে সব সময় কথা বলাবও আর প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তর্ক বাধে না আর—শুধু মাঝে-মাঝে রেকর্ডে তাঁর গান শুনি। অর্চনা আর আমি যখন কথা বলি, প্রফুল্ল বই খুলে বসতেও দ্বিধা করে না—তার একটা কারণ যে-সব গল্প আমার কাছে নতুন তার সবই জানা কিংবা বহুবাব শোনা। অর্চনার কথায় বাধা দেয় না সে, তার মুখের গল্পটাকে নিজের মতো ক'রে বলতে যায় না ; হয়তো, বলা শেষ হ'লে, কোনো হাসি-মাখা মন্তব্য করে। রাত্রে একেবারে খেয়ে যাই মাঝে-মাঝে, তারপর (অবশেষে, এত শিগগিব !) রাস্তায় বেরিয়ে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ভাবি—কিছুই ভাবি না। হয়তো আমাকে অসুখী জেনে ওরা আশ্রয় দিয়েছে, আমার অপমানিত বোধ করা উচিত, প্রতিদান দিতে না-পারলে আতিথেয়তা নেয়া উচিত না, হয়তো আমি অসহায়ভাবে অধীন হ'য়ে পড়ছি ওদের—এ-সব কোনো কথাই আমার মনে পড়ে না তখন। প্রফুল্ল আমার, আর আমার জীবন ওদের

জীবনের, কত বিপরীত, সে-কথাও তখনকার মতো ভুলে থাকি। কোনো জাতুমন্ত্রে আমিই যেন প্রফুল্ল হ'য়ে যাই, অর্চনাকে নিয়ে উষ্ণ-হ'য়ে-ওঠা তার শয্যার তাপ ছড়িয়ে পড়ে আমার শরীরে। এই রকম কোনো-কোনো সময়ে মদ খাবার ইচ্ছেও আর জাগেনি আমার—অনেক বড়ো আর অন্ধকার রাত্রিটাকেই যথেষ্ট মনে হয়েছে।

কিন্তু আমি অবশ্য তখনই জানতাম যে এর পর আরো আছে।

দশ

একদিন গিয়ে দেখি, প্রফুল্ল একলা ব'সে একটা ফরাশি ভাষার মাসিকপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটলো, প্রফুল্ল একজন ফরাশি চিত্রকরেব বিষয়ে বলতে শুরু করলে, কিন্তু আমার কানে ফাঁকা শোনালো তাব কথাগুলো, আর প্রফুল্ল—যাকে আমি নিজের মধ্যে সম্পূর্ণতাব জন্য তারিফ ক'রে এসেছি বরাবর—তাকে একটা ভাঙা টুকরোর মতো মনে হ'লো আমার। একটু পরে আমি জিগেস করলাম, 'মিসেস রায়কে দেখছি না?'

'তাঁর শরীরটা তেমন ভালো নেই আজ।'

'অসুখ করেছে!' বলামাত্র আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমাব কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক উদ্বেগ ফুটেছিলো নিশ্চয়ই, আমি বুঝলাম প্রফুল্ল চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মুহূর্তেরই জন্য। তাবপর সেও উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'তেমন কিছু না। আসুন।' পর্দা সরিয়ে আমাকে নিয়ে এলো তাদের শোবার ঘরে।

আর সেখানে আমি অর্চনাকে প্রথম দেখলাম।

জোড়া খাটের একটাতে শুয়ে আছে সে, গায়ে আঁটো উলের হলদে রঙের ব্লাউজ, কোমর অবধি সোনালি কম্বলে ঢাকা, কিন্তু পায়ের পাতা দুটি বেরিয়ে আছে। মাথার চুল ফাঁপা, চোখ লালচে আর ঈষৎ ফুলে-ওঠা, নাকের বাঁশিও তা-ই।

কাৎ হ'য়ে বই পড়ছিলো; প্রফুল্ল বললে, 'ইনি একবার দেখতে এলেন তোমাকে। উঠো না, শুয়ে থাকাই দরকার তোমার।'

'বসুন।'

ছোটো লেখার-টেবিল থেকে পাৎলা চেয়ারটা প্রফুল্ল আমার জন্য নিয়ে এলো। আমি বললাম, 'কী হ'লো? জ্বর?'

'ঠিক জ্বর না—এই সর্দি আরকি।'

'খুব অন্যায় এ-রকম অসুখ করা। কখন থেকে হ'লো?'

'কাল থেকেই টিপটিপ করছিলো মাথাটা, আজ সকালে স্নান করাটাই বোধহয় ভুল হ'লো।'

'স্নান করার জন্য কিছু হয়নি—'প্রফুল্ল বললে— 'সর্দি হবার হ'লে ঠেকানো যায় না। আর মাঝে-মাঝে হওয়াও ভালো—বিশ্রাম হয়, নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা যায়।'

'সকাল থেকেই শুয়ে আছেন?'

বেয়ারা এসে জানালে আপিশ থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। 'বসতে বলো। তোমার কিছু চাই, অর্চনা? গরম জলের ব্যাগ? চাই না? আচ্ছা, এই দিকের জানলাটা একটু খুলে দিই বরং—একেবারে সব বন্ধ থাকা ভালো না। আপনি তাহ'লে বসুন এখানে—আমি আসছি।' চটি পায়ে, ছিপছিপে, নিপুণ, প্রফুল্ল পরদা ঠেলে অদৃশ্য হ'লো।

আমি ক্ষমাহীনভাবে একই প্রসঙ্গের অনুধাবন করলাম।

'সকাল থেকেই শুয়ে আছেন?'

'এই শুয়ে-ব'সে কাটিয়েছি কোনোরকমে। প্রফুল্ল বলে সর্দি হয়েছে কি বিছানা নিতে হবে। বিলেতি অভ্যেস ওর।'

'ডাক্তার এসেছিলো?'

'এর জন্যে আবার ডাক্তার লাগে নাকি?'—অর্চনা হাসলো—'নিজে-নিজেই সেরে যায়। বছরে দু-তিন বার সর্দি আমার হাতে ধরা।'

'বছরে দু-তিন বার? আশ্চর্য!'

'এতে আর আশ্চর্য কী আছে।'

কী আছে, আমি তা জানি না। কিন্তু ততক্ষণে সর্দিটা আমার কাছে একটা রহস্যময় বিষয় হ'য়ে উঠেছে—রীতিমতো গবেষণার যোগ্য। আমি মনে করতে চেষ্টা করছি কবে আমার শেষ সর্দি হয়েছিলো (এ-সব ছোটোখাটো অসুখ ছাই করেই না আমার), কেমন লাগে সর্দি হ'লে, এ-বিষয়ে আমি কী শুনেছি, কিছু প'ড়েছি কিনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কোন সর্বশেষ বুজরুকি আবিষ্কার করেছেন এ-বিষয়ে। আর ততক্ষণ, অর্চনা শুয়ে আছে আমার সামনে, তার গায়ে হলদে রঙের আঁটো ব্লাউজ; কোমর অবধি সোনালি কম্বলে ঢাকা। শিয়রে হাঁস-গলার টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে, সেটা এমনভাবে বাঁকানো যে তার চুলে, ঠোঁটে, গলায়, বাহুতে আলো পড়েছে, সারা ঘরটাকে ঝাপসা রেখে আলোর পেনসিলে ফুটিয়ে তুলেছে এক নারীর শরীর। একবার একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো সে, পা দুটি গুটিয়ে নিলো কম্বলের মধ্যে।

'কষ্ট হচ্ছে?

'না। এই—একবার গরম লাগে, একবার শীত করে—সুবিধে পাই না।'

তার গলা ভারি, মুখ লালচে, চোখ সজল আর উজ্জ্বল, শুকনো ঠোঁট দুটিতে মাঝে-মাঝে জিভ বুলিয়ে নিচ্ছে। তার জিভের ডগাটুকু আগুনের শিখার মতো বিঁধলো আমার চোখে; তার নোনতা স্বাদ নিজের মুখের মধ্যে অনুভব করলাম যেন। কথা বলতে গিয়ে আমারও গলা ভারি হ'লো।

'জানলাটা ভেজিয়ে দিই?'

'না, থাক। আপনি বসুন। আপনার খবর বলুন। আজ রোববার ছিলো : কী করলেন সারাদিন ?'

'আমি আর কী করবো।'

'কেন ? কাজের মতো কাজ তো আপনারাই করেন।'

'বাজে!' অবজ্ঞায় আমার ঠোঁট বেঁকে গেলো। 'দয়া ক'রে বলবেন না আমার লেখা আপনার ভালো লাগে।'

'বলবো না ?'

'না। সেটা তুলে রাখুন প্রফুল্লর জন্য। আপনার কাছে তা আমি চাই না।'

অর্চনা একটু চুপ ক'রে রইলো, মুহূর্তের জন্য গম্ভীর দেখালো তাকে। তারপর হেসে বললে, 'ঠিক বলেছেন। প্রফুল্ল এত ভালোবাসতে পারে যে অন্যদেরটা বাহুল্য মনে হয়। আপনার লেখাও সে-ই পড়িয়েছিলো আমাকে। দিল্লিতে বাংলা বই তো বেশি পেতুম না।

'আপনি বিয়ের আগেই দিল্লিতে ছিলেন ?'—জবাবের সময় না-দিয়ে তখনই আবার বললাম, 'প্রফুল্লর সঙ্গে কবে প্রথম দেখা হ'লো ?

বেয়াদব প্রশ্ন সন্দেহ নেই, অর্চনা নাও পারতো জবাব দিতে। কিন্তু তাকে একটুও ক্ষুণ্ণ বা অপ্রতিভ মনে হ'লো না, যখন সে আস্তে-আস্তে সে-সব কথাও বললে আমাকে। বি. এ. পাশ ক'রে এম. এ. পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, ভাবছে বিদেশে যাবে, জর্মান শিখবে, তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করবে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমন সময় প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হ'লো; পনেরো দিনের মধ্যে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেলো ও-সব পরিকল্পনা, তিন মাসের মধ্যে বিয়ে হ'য়ে গেলো। কাকে বলে বিদ্বান মানুষ, প্রফুল্লর সঙ্গে মেলামেশার আগে ধারণাই ছিলো না তার। প্রফুল্ল ডিগ্রি নিয়েছে ইকনমিক্সে; কিন্তু মনে হয়

সে সবই জানে, সবই পড়েছে, আর তার সব পড়া আর জানা আলোর মতো জ্বলজ্বল করছে তার মনের মধ্যে। 'আমি যতই পড়াশুনো করি, ও-রকম যখন হ'তে পারবো না তখন আর চেষ্টা ক'রে কী লাভ।'

'নিজে বিদুষী না-হ'য়ে বিদ্বানের সেবা করাই ভালো মনে করলেন?'

'সেবা কেন? তার গালের রেখায় হালকা হাসি ফুটে উঠলো। 'আর যদি সেবাও হয় সেটা তো উভয় পক্ষেই। আমি চেয়েছিলুম প্রফুল্ল প্রোফেসরিতেই থাকে; "সংসার চালাবার" জন্য তাকে বেশি খাটুনিব সরকাবি কাজ নিতে হ'লো এ-কথা ভাবতে ভালো লাগেনি। কিন্তু—'

'কিন্তু?

'প্রফুল্ল বললে ইকনমিক্স তার ভালো লাগে না, ওটা আজকাল চড়া দামে বিকোয় ব'লেই সে নিয়েছিলো, আর তা-ই যদি হয় তাহ'লে তা থেকে সবচেয়ে মোটা মজুরি নিংড়ে নেয়াই তাব কর্তব্য। "ভেবো না আমি তোমার জন্য কোনো 'ত্যাগ' করছি"—আমাকে বলেছিলো— "ছাত্র পড়ানো আমার পক্ষে বিবক্তিকর, আব তাছাড়া কেমন ক'বে বাঁচবো সে-বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট ছবি আছে আমাব মনে, চাকরিটা তারই একটা উপায়।" আমি বলেছিলুম, "কিন্তু প্রোফেসরিতে অবসর বেশি— তুমি লিখতে পারবে, কবিতা লিখতে পারবে।" হেসে বলেছিলো, "সময়েব অভাবে, সুযোগের অভাবে কারো কখনো লেখা হয়নি এ-কথা বিশ্বাস্ কবি না। আর আমি যে ইকনমিক্সে পাশ করতে পেবেছি এতেই প্রমাণ হ'য়ে গেছে আমি কবি নই।" আসলে, প্রফুল্লর দুটো জীবন আছে; আপিশের কাজের মধ্যে সে একভাবে কাটিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের মনে সে একেবারে আলাদা—সেখানে সে কত গভীব আমিও তার তল পাইনি এখনো।'

এমনি, অর্চনা তার স্বামীর বিষয়ে। পুরুষকে ঘায়েল করার জন্য মেয়েরা অচেতনভাবেই সে-সব ফাঁদ তৈরি করে, এও হয়তো তারই একটা; হয়তো সে চেয়েছিলো এমনি ক'রে তার বিষয়ে আমাকে জাগাতে, আমার ঈর্ষাকে তীক্ষ্ণ ক'রে তুলতে।—কিন্তু তার কোনো দরকার ছিলো না; অক্টোপাসের শুঁড় আমাকে আগেই ধ'রে ফেলেছিলো। অদ্ভুত চতুরালি প্রকৃতির : ঐ সর্দির চেহারায় আমি দেখতে পেলুম এক নিখুঁত, নির্ভুল, প্রায় নির্লজ্জ অভিনয়। কোনো লক্ষণই বাকি ছিলো না : রাঙানো গাল, ছলোছলো চোখ, ফুলে-ওঠা নাক, নিশ্বাসের জন্য মাঝে-মাঝে খুলে-যাওয়া ঠোঁট দুটি—সব মিলিয়ে প্রেমিকার মতো তাকে দেখলাম আমি, কামনায় আমন্ত্রণকারিণীর মতো, হলদে আর সোনালি আবরণের তলায় এক রানীর শরীর উদ্ভাসিত হ'লো আমার চোখে, পূর্ণ, সুপক্ব, ঐশ্বর্যময়, যৌবনের চরম লগ্নে দৃপ্ত আর ক্ষুরধার। এই রকম দেখলাম তাকে আমি—সত্যি সে কেমন তা জানতে পারিনি কোনোদিন। আগে বলেছি তাকে দেখামাত্রই ভালোবেসে-ছিলুম, কিন্তু সেদিন মনে হ'লো আমি পারি তাকে ভালোবাসতে—সেই ক্ষমতা আর সম্ভাবনা আছে আমার: আরো বেশি—তাকে ভালোবাসতে না-পারলে আমার অস্তিত্বের কোনো অর্থই থাকে না। এমনি সম্বন্ধে বাঁধা শরীর আর মন। গৌরীকে ভালোবেসেছিলুম শরীর দিয়ে, সেই থেকে আমার মন তাকে ভুলতে পারলো না। আর অর্চনা—তাকে আমি 'মনে-মনে' ভালোবাসতে গিয়েই তার শরীরটাকে আবিষ্কার ক'রে ফেললাম, আর সেই থেকেই সর্বনাশের সূত্রপাত হ'লো।

তার সব কথা শুনে আমি বললাম, 'ভালোই হয়েছে। সুন্দরী আর সুখী মহিলাদের বিদুষী হওয়া উচিত নয়।'

জবাব দিলে, 'অন্য ছুটো ভাগ্যের বিষয়, কিন্তু কোনো কাজ করতে হ'লে বুদ্ধি চাই।'

'বুদ্ধিটাও ভাগ্য। আর কাজ বলতে কী বোঝেন ?'

আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'কিছু লিখছেন না আজকাল ?'

'না।' আমি অসহিষ্ণুভাবে বসার ভঙ্গি বদল করলাম। আবার বলছি, আমার লেখার কথা কিছু বলবেন না দয়া ক'রে। প্রফুল্ল আপনাকে ইনফেক্ট করেছে, এ-সব জিনিশকে অন্যায়রকমের বেশি মূল্য দিতে শিখেছেন তার কাছে। কিন্তু আমি এর জন্যে কানাকড়িও কেয়ার করিনে। যারা ঠিকমতো বাঁচতে পারে না তারাই লেখে। রুগ্ন তারা, জঞ্জাল তারা। যারা বাঁচতে পারে—যেমন প্রফুল্ল—তারা আর কোন ছুঃখে লিখতে যাবে। আমার এই ছাইভস্ম লেখার কথা আপনিও যদি ভুলতে না পারেন তাহ'লে আমাকে বিদায় নিতে হবে এখান থেকে।'

এক সেকেণ্ড আগেও ভাবিনি এইরকম কতগুলো বদমেজাজি কথা বেরিয়ে যাবে আমার মুখ দিয়ে। কিন্তু—তাকে ও-রকমভাবে দেখাব পর—মেজাজটা তো খারাপ হ'য়েই ছিলো আমার, আমি আর যা-কিছু বলতে যেতাম তা-ই মিথ্যে শোনাতো আমার কানে, আসল কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টার মতো শোনাতো। বিশ্রী লাগে—ঘুরিয়ে বলতে গেলেই ঘেন্না ধ'রে যায় নিজের উপর।

'ভুলতে না-পারলেও বলবো না ; এই কথা রইলো,' ব'লে অর্চনা গলা অবধি কম্বল টেনে দিলে। বোঝাই গেলো, আমার চ'লে যাবার ইঙ্গিত এটা। আমি একটু দেরি ক'রে উঠে দাঁড়ালাম।

'চলি। সেরে উঠুন তাড়াতাড়ি।'

'কাল আসবেন।'

বসার ঘরে এসে দেখি প্রফুল্ল তার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে ব'সে আছে, হাতে সেই ফরাশি ভাষার পত্রিকা। ঘরে আর কাউকে না-দেখে আমি বললাম, 'আপনার বন্ধু চ'লে গেলেন?'

'বন্ধু নয়, আপিশের লোক।'

'কখন গেলেন তিনি?'

'অনেকক্ষণ। একটা বেশ ভালো জিনিশ পড়ছিলাম এটাতে।' পড়ার জন্য তার চশমা লাগে, চশমা খুলে ফেলে আমার দিকে তাকালো। 'আসুন—' বাড়িয়ে দিলে বিলেতি সিগারেটে ভরা কাশ্মিরি কাঠের বাক্স।

আমি ব'সে-ব'সে একটি সিগারেট খেলাম, চেষ্টা করলাম বলার মতো কোনো কথা মনে আনতে। প্রফুল্ল বললে, 'আপনি কেমন আছেন?'

রোজ যার সঙ্গে দেখা হয় তাকে এ-কথাটা জিগেস করা অস্বাভাবিক। আমি বললাম, 'খারাপ দেখছেন?'

'ক্লান্ত দেখছি। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।—আসছি।' উঠে গিয়ে ঘরের কম-আলোর অংশে একটা বেঁটে আলমারি খুললো, ফিরে এলো তিনটে গ্লাশ আর কন্যাকের বোতল হাতে নিয়ে। ওগুলো নামিয়ে বললে, 'আপনার কী-রকম পছন্দ? সোডা?'

আমার ধারণা ছিলো প্রফুল্লর এ-সব অভ্যেস নেই। একবার তাকিয়ে বললাম, 'তিনটে গ্লাশ কেন?'

'একটা অর্চনার। গরম দুধের সঙ্গে খেলে সর্দিতে ভালো লাগবে। আগে দিয়ে আসি ওকে।' অল্প ঢেলে, গ্লাশ হাতে শোবার ঘরে গেলো। ছবির মতো চলাফেরা তার, যেন কোনো নাটকে পার্ট করছে। ফিরে এসে বললে, 'সোডা চাই আপনার?'

'না। ব্র্যাণ্ডিও চাই না।'

'একটুও না?'

'আমি আরম্ভ করলে থামতে পারি না। নেশা হ'লে যা-তা ব'লে ফেলি। তাই খাবো না। চলি।' ব'লে—প্রফুল্লকে আর কথা বলার সময় না-দিয়ে—আমি হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলাম। অপমান লাগলো আমার—অপদস্থ বোধ হ'লো—প্রফুল্ল যে আমাকে 'দেখিয়ে-দেখিয়ে' (তা-ই মনে হ'লো আমার) অর্চনাকে ব্র্যাণ্ডি দিয়ে এলো, এতে আমার পিত্ত জ্ব'লে গেলো রীতিমতো। তাকে কুটিল, ধূর্ত আর ঈর্ষাপরায়ণ মনে হ'লো সেই সময়ে; আমাকে নেশা করিয়ে, আমার মনের কথা টেনে বের ক'রে, আমাকে তার ঠাট্টার আর দয়ার পাত্র ক'রে তুলতে চায়। তা-ই আমার মনে হ'লো তখন।

কিন্তু আসলে—আমি ভালোই জানি—এ-রকম কোনো দুরভিসন্ধি তার ছিলো না। ভালোই জানি, কোনোরকম হীনতা তাকে স্পর্শ করেনি কখনো। সে চেয়েছিলো আমি যাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি, হয়তো নিজেরও মনের অব্যক্ত প্রতিবাদে লজ্জিত হ'য়ে আরো বেশি নিবিড় হ'তে চেয়েছিলো আমার সঙ্গে। এ-সবই তার কৌলীন্য বা সৌজন্যের প্রকাশ, তার মজ্জাগত কৌলীন্যের। কিন্তু সেদিন, সেই মুহূর্তে, আমার কাছে সে প্রফুল্ল রায় ছিলো না আর, হ'য়ে উঠেছিলো অর্চনার স্বামী, যে-স্বামীকে অর্চনা ভালোবেসে সুখী হ'তে না-পারলেও না-বেসে আরো বেশি অসুখী হবে। তাই তার ব্যবহারে কিছুই ভালো দেখতে পেলাম না; অভদ্রের মতো বেরিয়ে এলাম।

স্থির করলাম, আর যাবো না ওদের ওখানে। একদিন, দু-দিন, তিনদিন বাদ গেলো। মদ খেয়ে আর জুয়ো খেলে সন্ধেগুলো কাটিয়ে দিলাম। চতুর্থ দিনে আপিশে আমার জন্য টেলিফোন বাজলো।

প্রফুল্লর গলা। সে আমাকে আজ পাঁচটার পরে আপিশ থেকে তুলে নিয়ে যাবে, আমি থাকি যেন। 'কেমন? ঠিক তো?' ব'লেই টেলিফোন কেটে দিলে।

প্রথমে আমার মনে হ'লো তক্ষুনি টেলিফোন তুলে ব'লে দিই—না, যেতে পারবো না। তারপর ভাবলাম—টেলিফোনে সব বলা যায় না—আর এই আপিশের মধ্যে বলারও অসুবিধে—দেখা হোক। পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে থেকেই বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম, প্রফুল্ল গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা পার হ'লো। শীতের সন্ধ্যা, কুয়াশা হয়েছে, স্ট্র্যাণ্ড রোডের ভিড়। তার মধ্যেও সুন্দর দেখলাম তাকে, বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক আনন্দ ঝলক দিলো হৃদয়ে। আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো।

আমি তার হাত ধ'রে বললাম, 'প্রফুল্ল, আমাকে আর যেতে বোলো না।' (হঠাৎ 'তুমি' ব'লে ফেললাম।)

প্রফুল্ল শুধু তাকালো একবার; আবছায়ায় দেখলাম শান্ত আর গভীর তার চোখ।

'এতে কারোরই কিছু ভালো হবে না, প্রফুল্ল। আমি একলা-স্বভাবের মানুষ, কোনো দিন কোনো জায়গায় মিশতে পারিনি। কাউকে কিছু দেবার নেই আমার। তাই আমি নিতেও পারি না। এটা কেমন ক'রে হ'লো যে এতদিন ধ'রে বেঁচে আছি অথচ একজনও বন্ধু নেই আমার?'

'একজনও নেই তা নয়।'

'না। আমার সব কথা জানো না তুমি। জানলে ও-কথা বলতে না।'

'সব জানি। আপনি চলুন।'

তার মুখের উপর চোখ রাখলাম। সেখানে কোনো ভাবান্তর হ'লো না।

'তবু আপনি যেতে বলছেন আমাকে?' (আবার 'আপনি' এলো আমার মুখে)—'আপনার কথায় "না" বলা কত কঠিন আমার পক্ষে, তা জেনে-শুনেই আমার উপর সুবিধে নিচ্ছেন?'

'আসুন। ঐখানে গাড়িটা রেখেছি। এই দিকে।'

তার সঙ্গে কয়েক পা হাঁটার পর আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি কি আমাকে মহাত্মা হ'তে বাধ্য করবে? নয়তো পাষণ্ড?'

'আপনি যেমন আছেন সেটাই সবচেয়ে ভালো,' প্রফুল্ল হাসলো।

এখানে ওদের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ; আমার অস্তিত্বটা, আমাকে অমান্য ক'রে, যেন প্রফুল্ল আর অর্চনার স্রোতের মধ্যে ভেসে চললো। তারা হ'য়ে উঠলো আমার সারা জগৎ; কিন্তু তাদের অবশ্য অন্য সংসর্গের অভাব ছিলো না। আগে সেটা তেমন বুঝিনি; যেন ধ'রেই নিয়েছিলাম তারা আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না তাদের ঘরে; কিন্তু এবারে তারা একটু বেশি মাত্রায় সামাজিক হ'য়ে উঠলো; আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধবী, বন্ধুপত্নী—এদের আক্রমণ সহ্য করতে হ'লো আমাকে—শুধু তা-ই নয়, তার মধ্যে পার্টও নিতে হ'লো একটা। তখন, যুদ্ধের শেষের দিকে, কলকাতায় ককটেল-পার্টির নতুন চল হচ্ছে; প্রফুল্ল, যে কখনো হাওয়াই-শার্ট পরেনি, ঐ ফ্যাশানটাকে মেনে নিলে; এক-এক সন্ধ্যায় তার ঘর সব অর্থেই নানা রঙের মেয়ে পুরুষে ভ'রে যায়; যে যার গ্লাশ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তারা কথা বলে, কোনো একজনই অন্য কোনো-একজনের সঙ্গে (তাকে স্পষ্টত ভালো লাগেও) খুব বেশিক্ষণ কথা বলে না; মানুষগুলো বেশ একটা নিয়মিত ছন্দে ঘরের নানা অংশে নানা দলের মধ্যে আবর্তিত

হ'তে থাকে ; যে-কোনো একটা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে না কেউ, আলাপের বিষয়টাকে বিভিন্ন বক্তার রুচি ও শক্তি অনুসারে পিছলে-পিছলে স'রে যেতে দেয়। রোগ, মৃত্যু, দুঃখ কখনো উল্লিখিত হয় না (যুদ্ধের সম্পর্কেও না) ; প্রফুল্লর সঙ্গে আমার আগে যে-সব 'তর্ক' হ'তো সেগুলো সম্ভবপরতার বাইরে চ'লে যায়, একটা মৃদু গোলাপি, কবোষ্ণ প্রীতির আবহাওয়া, মদে উদ্দীপিত হ'য়ে, আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে, তার সংক্রমণ আমিও ঠিক এড়াতে পারি না। এড়াতে পারি না, কিন্তু একেবারে ধরাও পড়ি না কখনো, আমার প্রতিরোধ কখনো ভেঙে পড়ে না, আর সেটা বুঝে, আমাকে তার মধ্যে মানিয়ে নেবার জন্য, অর্চনা আর প্রফুল্লর পরিশ্রমের কথা ভেবে আমার প্রায় হাসি পায় আজকাল—প্রায় কান্না পায়।—কোনো-কোনোদিন তাদেরও নিমন্ত্রণ থাকে বাইরে, সেই দিনগুলোই আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টের, তাদের পক্ষেও।

আমি সন্দেহ করি, তার বাড়িতে এ-সব পার্টি ডাকার মধ্যেও প্রফুল্ল আমার কথা গভীরভাবে ভেবেছিলো। আমাকে নানা মানুষের সংস্পর্শে এনে, আমার মনটাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো সে, অন্য খাদে বইয়ে দিতে চেয়েছিলো। যাতে আমি নিরন্তর একই কথা না ভাবি, বিক্ষেপের স্বাস্থ্যকর বিশ্রাম পাই, যাতে আমি বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের উগ্র স্বাতন্ত্র্যকে ভুলতে পারি : এ-ই ছিলো প্রফুল্লর চেষ্টা। আর অর্চনা—সে ছিলো আমাকে নিয়ে গর্বিত আর চিন্তিত, বন্ধুদের কাছে অন্য জগতের নমুনাস্বরূপ আমাকে উপস্থিত ক'রে তার আনন্দ যতটা ছিলো উদ্বেগ তার কম না ; আমাকে শুধু সহনীয়গোছের পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতেই রাজি করায়নি সে, দু-জন অতি সুবেশ ভদ্রমহিলার মধ্যেও বসিয়ে দিয়েছে, আর আমার কথা শুনে (কেননা কথা আমাকে বলতেই

হয়েছে) ভদ্রমহিলারা যখন কৌতুক অনুভব করেছেন, দূর থেকে দৃষ্টি পাঠিয়ে তার উৎসাহ আর সমর্থন জানিয়েছে আমাকে। আমি যেহেতু বানিয়ে কথা বলি না, যখন যা মনে হয় তা-ই বলি, আমার কথা অনেকের কাছেই কৌতুকাবহ মনে হয়েছে, আমার খোলামেলা ভাবটাকেই একটা ভঙ্গি ব'লে ধ'রে নিয়েছে তারা—অর্চনাকে বন্ধুদের কাছে লজ্জা পেতে হয়নি। ঘরের মধ্যে তার উপস্থিতি আমি ভুলতে পারিনি কখনো, ভুলতে দেয়নি সে ; চোখ ফিরিয়েই তার চোখ দেখতে পেয়েছি প্রায় সব সময়, কখনো পৌঁছতে দেরি হ'লে তার দিকে তাকিয়েই বুঝেছি কত অধীর হ'য়ে সে অপেক্ষা করছিলো। আর আমার বিষয়ে এই আগ্রহ তার—এটাকে গোপন করারও তার কোনো চেষ্টা ছিলো না, আমি যে একজন অতিথি মাত্র নই, বলতে গেলে এই বাড়িরই অন্তর্গত, তার ব্যবহার তা বুঝিয়ে দিতো সকলকে। শুধু তার নয়, প্রফুল্লেরও। এটা কি তাদের পরামর্শের ফল, না কি তারা যে যার মনে স্বাধীনভাবে আমার বিষয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলো ? জানি না, জানবার উপায় নেই আমার। কিন্তু এটা জানি তারা আগুন নিয়ে খেলা করছিলো, জাতিসাপ নিয়ে খেলা করছিলো। এও জানি, তারা নিজেরাও তা জানতো। তারা—অন্তত প্রফুল্ল—আশা করছিলো সে সাপটাকে খেলিয়ে-খেলিয়ে নির্বিষ ক'রে তুলতে পারবে, একটা শান্ত, শুভ্র পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে পারবে এই দ্বন্দ্বকে। অদ্ভুত সাহস তার ; তার ক্ষমতার কথা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুদিন—কিছুক্ষণের জন্য এমনও মনে হয়েছিলো যে সে-রকম একটা পরিণাম অসম্ভব নয়। কিন্তু জাতিসাপটা জাতিসাপই : বার-বার শূন্যে ছোবল মারলেও বিষ তার ম'রে যায় না ; আর নীল গলা নিয়ে শুভ্রতার মধ্যে মাথা তুলে যে দাঁড়াতে পারে, সে-মহাদেব আমি নই।

আমি আমার পার্ট ক'রে গেছি, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আমার স্বস্তি ছিলো না। তার প্রথম কারণ: প্রফুল্লর পার্টিতে আমাকে ভদ্রলোকের মতো পরিমিত মাত্রায় পান করতে হয়; সেটা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক। দ্বিতীয় কারণ: সব সময় আমার ইচ্ছে করে অন্য সবাই চ'লে যাক, প্রফুল্ল আর অর্চনার সঙ্গে আমি শুধু থাকি। সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে করে অর্চনার সঙ্গে একা হ'তে। এই সমস্তটা সময় ভ'রে, মুহূর্তের জন্যও, তার জন্য কামনা থেকে নিষ্কৃতি ছিলো না আমার। সেইজন্য, অন্যদের কাছে যা ছিলো উপভোগ আমার পক্ষে তা ছিলো যন্ত্রণা। তাকে না-দেখে টি কতে পারি না তাই যেতেই হয়। গিয়ে ভোগ করি, আর-কিছু না—শুধু যন্ত্রণা। এমনি, দিনের পর দিন।

অথচ, অর্চনাকে যখন একা পাই (পেয়েছি মাঝে-মাঝে, হয়তো কোনোদিন প্রফুল্লর ফিরতে দেরি হয়েছে, কি কোনো কাজে বেরিয়েছে সে—একবার আপিশের কাজে দু-দিনের জন্য দিল্লি যেতে হ'লো তাকে) —যখন একা পাই, তখন আমার অস্বস্তি আরো বেড়ে যায়। এমনকি, অর্চনাও একটু আত্মসচেতন হ'য়ে পড়ে যেন। তখন কি আমার তা-ই করা উচিত ছিলো, যা গৌরী করেছিলো আমাকে—সেই রাত্রে? তাহ'লে, অন্তত,একরকমের নিষ্পত্তি হ'তো। কিন্তু না: হ'তো না—তখনই ভেবেছি আমি—তাতে আমার আগুন আরো প্রবল হ'য়ে উঠতো—যে-কোনো দিক থেকেই দেখা যাক, এই ব্যাপারের উপসংহার মানেই কোনো-এক পক্ষের সংহার। এবং সংহার যার প্রয়োজন সে-মানুষ নিঃসন্দেহে আমি। এ-বিষয়ে কি এখনো কোনো সন্দেহ আছে যে আমার চোখের সামনে—আর আমারই জন্য—একটা সুন্দর জিনিশে ভাঙন ধরলো? জানি—অনেক আগেই জেনেছি পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়, শেষ পর্যন্ত নির্ভর-যোগ্য নয়; হিমালয় গুঁড়ো হ'য়ে যাবে, সূর্য নিবে যাবে একদিন।

কিন্তু ও-সব হ'লো দেবতার কথা, মানুষের নয় ; আমি একজন মানুষ মাত্র, যতদিন বেঁচে আছি, আমার কিছু এসে যায় না ওতে। সভ্যতার নাভিশ্বাস ওঠে, সাম্রাজ্য বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। তা যাক, অন্তহীন সমুদ্র থেকে আবার এক রঙিন বুদ্বুদ জেগে ওঠে। বিশ্ব থাক তার নিজের মনে, জগৎ যেমন খুশি চলুক ; আমার এই মাত্র কয়েকটা বছরের আয়ুর মধ্যে তা নিয়ে কোনো মাথা-ব্যথা নেই। কিন্তু একটা ছোটো, ব্যক্তিগত এবং সেই জন্যই অপূরণীয় ক্ষতির দৃশ্য চোখে দেখলেই দুঃখ পেতে হয়। এক দিনের যুদ্ধে পাঁচ হাজার মানুষ ম'রে যায়, সেটা একটা খবর মাত্র ; কিন্তু রাস্তায় কোনো একটি অচেনা যুবকের মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখলে মৃত্যু একটা অভিজ্ঞতা হ'য়ে ওঠে। প্রফুল্ল আর অর্চনার বিবাহের মধ্যে এই ফাটল—এও তেমনি। যার এখনো অনেক বাঁচার কথা, বেড়ে ওঠার কথা, সেই কোনো যুবকের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মতোই কষ্টের— আর তেমনি খাপছাড়া। বিয়ে জিনিশটা যে মানুষের গড়া নিয়ম মাত্র, প্রকৃতির কোনো বিধান নয়, তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে। কিন্তু ওদের দু-জনকে অন্য চোখে দেখেছিলাম আমি। আমার বাবা আর মা-র মতো দম্পতী নয় তারা ; আমার চেনাশোনা অন্য কোনো দম্পতীর মতো নয়। শুধু যে তারা দেখতে-শুনতে 'মানিয়েছে' তা নয়, তারা পরস্পরের ছন্দে বাঁধা, উপযোগী, সহযোগী, প্রয়োজনীয়। গরমিলের অভাবটাকেই তারা সুখ ব'লে জানেনি, সুখটাকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে, তাদের পক্ষে প্রায় একটা প্রাকৃত পদার্থ সেটা তাদের ঘরে পা দিয়েই বুঝেছিলাম। আমি জানি, প্রফুল্লর সঙ্গে চোদ্দ বছর কাটাবার পর আমার মতো উন্মাদ মানুষকে ভালো না-বেসে উপায় নেই ; জানি, তৃপ্তির পরের ধাপেই ক্লান্তি অপেক্ষা ক'রে থাকে, পরীক্ষার সামনে না-পড়া পর্যন্ত আমাদের সব চাহিদা আমরা জানতে পারি না ; জানি, পৃথিবীর প্রত্যেক রানীর

মধ্যে দাসী হবার দুরন্ত বাসনা লুকিয়ে থাকে। সবই জানি—কিন্তু তাই ব'লে নষ্ট হবে এমন একটা সুন্দর জিনিশ! আমারই বা এত শক্তি থাকবে কেন, এত দুর্বল হবে কেন অর্চনা। আমি যে প্রায় সেটাকে স্থায়ী ব'লে ভেবেছিলাম, প্রায় বিশ্বাস রেখেছিলাম তাতে! কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে—দিনে-দিনে আমি তা দেখতে পেয়েছি; দেখেছি অর্চনার চোখে, আর মাঝে-মাঝে প্রফুল্লর আকস্মিক চোখ ফিরিয়ে নেয়ায়। তাদের পার্টি, তাদের আমোদ-উৎসব—তারই তলে-তলে ধ্বংসে পড়ছে যা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান। তারা জানে তা, আমিও জানি।—কিন্তু আমার এই 'জয়ে' আমি উল্লসিত হ'তে পারিনি; আমার মন মূঢ়ের মতো বলেছে—'তাহ'লে এও সম্ভব!' কবি প্রফুল্ল রায়কে সাপ্লাই-আপিশের ডিরেক্টরের চেয়ারে দেখে প্রথম যে-রকম লেগেছিলো, সেই রকম মোহভঙ্গের আঘাত যেন, কিন্তু তার চেয়েও আরো অনেক তীব্র। আর এজন্যেই আরো বেশি অস্বস্তি আমার, আরো বেশি যন্ত্রণা। এজন্যেই অর্চনাকে একা পেয়েও পেলাম না আমি।

শুধু তখনই এই যন্ত্রণা আমি কিছুটা ভুলে থাকতে পেরেছি, যখন—শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ি-পড়ি ততদিনে—যখন প্রফুল্ল মাঝে-মাঝে তার গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছে আমাদের নিয়ে। রাত্রে, ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়ার পর, নিজেরা খেয়ে নিয়ে (তার মধ্যে আমিও) প্রফুল্লর এক-একদিন বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হ'তো। বড়ো আমেরিকান গাড়ি তার, সামনের আসনেই তিন জনের জায়গা হ'য়ে যায়, অর্চনা মাঝখানে: ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ছুটতো তার গাড়ি, লেকে, ময়দানে, খিদিরপুরে গঙ্গার ধারের রাস্তায়, কখনো জ্যোৎস্না-রাত্রে এমনকি বজবজ পর্যন্ত। এর জন্য—তেলের তখনো কড়াকড় ব'লে—অনেক দিন ট্যাক্সি ক'রে বা বাস্-এ ক'রেও আপিশে যেতে হয় তাকে,

কিন্তু এই নৈশ ভ্রমণের উপর কী-রকম একটা ঝোঁক প'ড়ে গেলো তার। এখন বুঝতে পারি, নিজেকে শান্ত করার জন্য এই উপায় সে বেছে নিয়েছিলো—সে, প্রফুল্ল রায়, তারও শান্ত হবার প্রয়োজন ঘটছে ততদিনে। কিন্তু তখন এ-কথাটা বুঝেও বুঝিনি ; তার কারণ, গাড়ি যতক্ষণ চলেছে আমি দেহে-মনে আধো ঘুমের মতো আরাম অনুভব করেছি। মসৃণ গতি, স্তব্ধতা, অন্ধকার ; তার মধ্যে অর্চনার দেহের উষ্ণতাও সহ্য করা কঠিন হয়নি। শুধু ঐ সান্নিধ্যের জন্যই একরকমের নিভৃত অবকাশ গ'ড়ে উঠেছে তার সঙ্গে আমার ; অথচ, প্রফুল্ল কাছেই আছে ব'লে, কাঁটাগুলো এড়াতে পেরেছি তখনকার মতো। যেন অর্চনার সঙ্গে একা আছি, আবার তারই মধ্যে প্রফুল্ল একজন অংশিদার। একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ আর নৈর্ব্যক্তিক সেই গতির চেতনার মধ্যে ডুবে গেছি আমি, অন্ধকারের ভাঁজ খুলে-খুলে মিশিয়ে দিতে চেয়েছি নিজেকে। কেউ বেশি কথা বলেনি, পথে লোক নেই, প্রফুল্ল স্পীড দিয়েছে গাড়িতে, অর্চনার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে আমি জানলার কাচ তুলে দিয়েছি। 'সাবধান, যা অন্ধকার। একটু আস্তে চলো না।' অর্চনার কথায় প্রফুল্ল ফিরে তাকিয়েছে ; অন্ধকারে তার মুখটা কেমন শাদা লেগেছে আমার চোখে। 'ভেবো না, আমি খুব ভালো চালাই।' এমন ভাবে বলেছে যেন অর্চনা তার নতুন-চেনা কেউ। আর আমার হঠাৎ মনে হয়েছে যে এই তো প্রফুল্লর সুযোগ। সে কি পারে না হঠাৎ কোনোরকম কায়দা ক'রে আমাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিতে ?

এই সব ভ্রমণের শেষে তাদের বাড়িতেই ফিরেছি, গরম কফি বা কোনো লিকিয়ার নিয়ে গল্প করতে-করতে রাত্তির দুটো বেজে গেছে। ভোর হ'লেও আমার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু কোনো-এক জায়গায় থামতেই হয়। প্রফুল্ল আবার আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে, অর্চনাও

সঙ্গে এসেছে কখনো। একদিন—পরিষ্কার চাঁদ ছিলো আকাশে, আমার সঙ্গে ওরাও নেমে জ্যোছনায় দাঁড়ালো একটু। ওদের গাড়ি চোখের বাইরে চ'লে যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকিয়ে থাকলাম। কড়া নাড়ার আগেই সুধা দরজা খুলে দিলে। জিগেস করলে :

'উনি কে ?'

'কার কথা বলছো ?'

'একজন মেয়েছেলে দেখলাম।'

'মেয়েছেলে' কথাটা শুনে আমার বমি পেলো। কিন্তু সুধা ঐ রকমই বলে।

'ওঁর নাম জানতে চাও ? অর্চনা রায়। তুমি কি জেগেই ছিলে ?'

'আর ভদ্রলোকটি ?'

'ওঁর স্বামী।'

'ও, বিয়ে হয়েছে ?'

'শুনলেই তো।'

'আর স্বামীর নাম ?'

'প্রফুল্ল রায়। আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'ও। তুমি খাবে ?'

'না।'

'প্রায়ই খেয়ে আসো আজকাল ?'

'ওঁদের বাড়িতেই খাই।'

'এত রাত্রে খাও ?'

'খাওয়ার পরে ওঁদের সঙ্গেই বেড়াই।'

সুধা আর-কিছু বললে না। বাড়িতে না খাওয়া, রাত ক'রে ফেরা—এগুলো অবশ্য নতুন নয় তার কাছে, কিন্তু আমার এই সত্যভাষণের

পরে এটাও তো বলতে পারতো যে আমার স্ত্রী হিশেবে তারও নিমন্ত্রিত হবার অধিকার আছে। কিন্তু না—আর-কিছুই বললে না, গোরুর মতো সহিষ্ণু আর মন্থর ভঙ্গিতে বিছানায় উঠলো। আমি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম তার পাশে ; অর্চনার কথা ভাবতে-ভাবতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলাম।

যতদিন ধ'রে এই পাতাগুলো লিখছি, ততদিনে আমার 'অবস্থা'র আরো 'উন্নতি' হয়েছে, মাঝে-মাঝে আমাকে ঘরের বাইরেও যেতে দিচ্ছেন এঁরা ; ভয় হচ্ছে কবে না এঁরা ব'লে বসেন আমি 'সেরে গেছি'। তার আগে দু-একটা কাজ সেরে নিতে হবে। প্রফুল্লর কথাও আরো একটু বলতে চাই।

বলতে চাই এই কথাটা যে শেষে যা ঘটলো তাতে প্রফুল্লরও অনেকখানি হাত ছিলো। নিজের উপর থেকে দায়িত্ব আমি সরিয়ে নিতে চাচ্ছি না—সেটা সম্ভবই নয় ; কিন্তু অদ্ভুত কথাটা—আর সত্য কথাটা—এই যে প্রফুল্ল আমারই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলো ; যে-অস্ত্র নিয়ে আমার মুখোমুখি সে দাঁড়িয়েছিলো, তার একটা মুখ তারই দিকে উদ্যত ছিলো সব সময়। সব সময় আমাকে যার সঙ্গে লড়তে হয়েছে সেটা প্রফুল্লর—সন্দেহ নয়, ঈর্ষা নয়—তার ভালোত্ব। আমার স্ত্রীর মতো 'ভালো' ছিলো না সে ; নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়, নির্বোধভাবে ভালো নয়—সক্রিয়, সচেতন, চিন্ময়ভাবে ভালো ; অন্যকে প্রায় পাগল ক'রে দিতে পারে, এমনি একগুঁয়ে, অবিচল, ক্ষমাহীন ভালোত্ব তার। আমার বাবার মতো প্রবলের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যায়, সুধার মতো আধা-মানুষকে মাড়ানো যায় পায়ের তলায়—কিন্তু যে-মানুষ একই সঙ্গে আমার মা-র কথা আর বাবার কথা মনে পড়িয়ে দেয় আমাকে, তার বিরুদ্ধে আমি কী করতে পারি ? আমার বাবার মতোই তার স্নায়ুর জোর, মনের জোর, আর প্রখর সম্মানবোধ ; আমার মা-র মতোই তার লজ্জা,

মৃদুতা, সহনশীলতা। অর্চনার প্রতি আমার আসক্তি বুঝতে তার দেরি হয়নি—কেনই বা হবে? ভালোবাসা লুকোনো যায় না; ও-জিনিশটা রোদের তাপের মতো; তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যায়; কোনো ভাষার দরকার করে না। কোনো মেয়েকে কেউ যখন ভালোবাসে সে-মেয়ে আধখানা চোখে তাকিয়েও তা বুঝতে পারে, আর, হয়তো, তার চেয়েও আগে বোঝে সেই অন্য পুরুষ, যে তাকে ভালোবাসে। বুঝে, প্রফুল্লর উচিত ছিলো আমাকে অপমান করা, তাড়িয়ে দেয়া: অন্তত, খুব গম্ভীর, নিপুণ, ভদ্রভাবে, ডাক্তারের অপারেশন করার মতো, আমাকে তাদের জীবন থেকে উপড়ে ফেলা। ঈশ্বর জানেন, সেটা আমারও মনোমতো হ'তো। সহজ হ'তো আমার পক্ষে, যদি প্রফুল্ল আমার বাবার মতো বলতো, 'এ-মুহূর্তে বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে!' মনে-মনে তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতুম তার জন্য। কিন্তু প্রফুল্ল সে-রকম কিছু করলে না; উল্টে আমাকে ধ'রে রাখার জন্যই তার স্নিগ্ধ উদ্যম অনবরত খরচ ক'রে চললো। কেন?—সোজা কারণ: সে মাথা উঁচু রাখতে চেয়েছে, আমাকে ত্যাগ ক'রে ছোটো হ'তে চায়নি স্ত্রীর কাছে আর নিজের কাছে। আমি জানি না, এই সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে অর্চনার সঙ্গে কী-রকম কথা হয়েছিলো তার, কিংবা কোনো কথা হয়েছিলো কিনা, আমার উপন্যাস লেখার অভ্যেস সত্ত্বেও ও-রকম কোনো আলাপের খশড়া বিশ্বাসযোগ্যভাবে ধরা দেয় না আমার মনে। কিন্তু প্রফুল্ল মনে-মনে কী ভেবেছে তা আমি অনুমান করতে পারি। ভেবেছে: 'ধীরেশ্বরকে সরিয়ে দিয়েই বা আমার লাভ কী, যখন দেখছি অর্চনার মন ইতিমধ্যেই ওর দিকে ঝুঁকেছে? মানুষকেই সরানো যায়, ভাবনাকে তো নয়।' ভেবেছে: 'তিনজনের পক্ষেই কষ্টকর হ'য়ে উঠছে ব্যাপারটা, কিন্তু অন্যের কষ্ট কাটাবার জন্য আমি কি আত্মসম্মান

খোয়াতে পারি? বিশেষত, বীরেশ্বরকে ঈর্ষা করার সত্যিই যখন কারণ ঘটলো, তখন ওর কোনোরকম বিরুদ্ধতা করা তো একেবারেই অসম্ভব।' আর ভেবেছে: 'বীরেশ্বরকে আমার ভালো লাগে; আমাকে কি তার বন্ধুতা থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে, যেহেতু আমার স্ত্রী তাকে ভালোবাসে?' বুদ্ধি দিয়ে এমনি ভেবেছে প্রফুল্ল; আর, এদিকে, দিনের পর দিন, তার হৃদয়টাকে পোকার ঝাঁক খুঁটে-খুঁটে খেয়েছে। আমি তা দেখতে পেয়েছি তার মুখে; অর্চনার মুখেও দেখেছি তার বেদনা। কিন্তু অর্চনার মুখেই এও দেখেছি যে আমাকে চোখে না-দেখলে তার বাঁচা অসম্ভব। অন্তত সে তা-ই ভাবছে।

অতএব আমাকেই এটা শেষ ক'রে দেবার উপায় ভাবতে হ'লো। ভালোর বিরুদ্ধে একটিমাত্র অস্ত্র জানা ছিলো আমার: বর্বরতা। সুধা আর প্রফুল্ল (দুটো নাম একসঙ্গে লিখতেই আমার খারাপ লাগছে): একজনের নির্বোধ শহীদপনা (যেটা সংসারে 'ভালো' নামে চলে), আর অন্য জনের বিষয়ে আমার এই ভয় যে সে হয়তো আমাকে বদলে দিতে পারে—ঐ দুটোরই বিরুদ্ধে আমার আত্মরক্ষার উপায় ছিলো—আগেই বলেছি—নিজেকে অপ্রীতিকর ক'রে তোলা। সুধার বেলায় হাতে-হাতে ফল পেয়েছিলাম, কিন্তু প্রফুল্ল আমাকে অনেক দূর পর্যন্ত হারিয়ে দিলে। প্রথমে ভেবেছিলাম সোফায় পা তুলে ব'সে আর গায়ে-জামায় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আর রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কথা ব'লেই তাকে (আর অর্চনাকে) আমার উপর বিরাগ শেখাতে পারবো। ভেবেছিলাম, যন্ত্রটা সূক্ষ্ম ব'লেই অল্প আঘাতেই বিগড়ে যাবে। কিন্তু—এটা বুঝতে অল্প একটু দেরি হ'লো আমার—শুধু সূক্ষ্মই নয়, এমন মজবুত যে তার ছিঁড়তে হ'লে ছোটোখাটো উপদ্রবে কুলোবে না, রীতিমতো অত্যাচার চাই। তাছাড়া, একবার 'শিল্পী' ব'লে পরিচিত

হ'তে পারলে—দুঃখের বিষয়—রূঢ়তাকেও প্রতিভারই লক্ষণ ব'লে চালানো যায়—অন্তত, সে-রকম ভাববার লোকের অভাব ঘটে না। আর তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে, অন্য সব কথাই শুকিয়ে ঝ'রে গেলো; জেগে রইলো শুধু এই অনুভূতি যে আমাকে না-হ'লে তাদের চলে না, তাদের না-হ'লে আমার।

আর এমনি ক'রেই, শেষ পর্যন্ত, আমি এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম যে প্রফুল্লকে স্থূলতম একটা আঘাত দিতে হবে; আমার যে পরিচয় সুধা পেয়েছে, তার চেয়েও প্রকাণ্ড কোনো স্থূলতার আঘাত। প্রফুল্লর ভালোত্বটাই জবরদস্তিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—কিন্তু আমিও তার যোগ্য জবাব দিতে পারি! আমার প্রতি বিতৃষ্ণায় তাকে মূর্ছিত ক'রে দেবো আমি, এমন করবো আমার নাম শুনলে তার বমি পাবে—তখন দেখবো আমাকে ছুঁড়ে না-ফেলে কেমন ক'রে পারে সে!

অবশ্য সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো না। আমার মনে এ-রকম একটা আক্রোশও ছিলো যে প্রফুল্ল একটা বিরাট প্রলোভনের সামনে নিত্য ছেড়ে রাখছে আমাকে, অথচ আশা করছে আমি তাতে ধরা দেবো না। আর চেয়েছিলাম—যদিও তার কোনো প্রয়োজন আর ছিলো না—তবু চেয়েছিলাম অর্চনাকে এই কথাটা বলতে যে তাকে আমি চাই।

এক পাব্লিশরের কাছে হঠাৎ কিছু টাকা পেয়েছিলাম সেদিন। সন্ধ্যা তখন, সময়টা বোধহয় ফেব্রুয়ারির আরম্ভ বা মাঝামাঝি—সেই কয়েকটা বিরল দিনের একটি, যখন কলকাতায় নতুন ক'রে শীত নামে, আর তার পরেই দপ ক'রে আকাশ তেতে ওঠে। কলেজ স্কোয়ার থেকে বাস্ ধ'রে ধরমতলার মোড়ে নামলাম। ভরপুর যুদ্ধের সময়, জাপানিরা আসামে হানা দিচ্ছে, হিটলার রাশিয়াতে—আর সন্ধে হ'লেই কলকাতার

অন্ধকারে জেগে উঠছে অদ্ভুত, অগুনতি, ফেনিল, উদ্দেশ্যহীন ভিড়। সেই একটা সময়, যখন আধ-মরা, মরচে-পড়া বাঙালির জীবনেও কিছু তীব্রতা এসেছিলো। বোমার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ছেলেখেলা ব'লে প্রতিপন্ন হ'লেও সাইরেন শুনলেই আশঙ্কায় ও আশায় বুক কাঁপে সকলেরই—তবু তো একটু অনিশ্চয়তা, নিয়মের ভাঙন, বাঁধা রুটিনের বদলে হঠাৎ পাগলামি—এক মুহূর্তে ম'রে যাবার, খোঁড়া হবার, যন্ত্রণা পাবার সম্ভাবনা, ইংরেজের নাকানিচুবুনির দৃশ্য দেখার রোমাঞ্চ, বুঝি বা ইংরেজকে তাড়ানো যাবে এবার, জাপানি আসবে, রুশ আসবে, নেতাজী আসবেন, এই সব জল্পনার উত্তেজনা—আর অন্ধকারে, বোমা-ঠেকানো দেয়ালের আড়ালে, বোমা-ঠেকানো সিঁড়ির তলায়, এমনকি বোমা-ঠেকানো গর্তের মধ্যে—নতুন, অদ্ভুত, কল্পনাতীত যৌন সুযোগের মানস চিত্র। যা ভাবা যায় না, এমন যে-কোনো ঘটনা যে-কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে : বন্ধ হ'তে পারে কলের জল, বিকল হ'তে পারে ইলেকট্রিসিটি, হাতে আসতে পারে লাখ টাকা, সাইরেন বাজলে অর্ধেক সিঁড়িতে পাশের ফ্ল্যাটের ন্যাকা মেয়েটা ঢ'লে পড়তে পারে গায়ের উপর। অবশ্য এর মধ্যেও বাঙালি তার সাবধানতা হারায়নি, রাত একটু ভারি হলেই সম্পূর্ণ রঙ্গমঞ্চ খাকি কোর্তাকে ছেড়ে দিয়ে বাবুরা স'রে পড়েন তাঁদের গৃহদুর্গে, আর বঙ্গললনারা সিনেমা দেখতেও রাত ক'রে চৌরঙ্গিতে আসেন না। তবু, অন্তত সন্ধেবেলার ভিড়ের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় ছত্রিশ জাতের তালগোল-পাকানো উন্মাদনার ছবি।

আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। কলকাতার ভিড় বরাবর ভালো লাগে আমার : কোনো-কোনো রাত্রে, পকেটে মাত্র কয়েক আনা পয়সা নিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়েছি পথে-পথে, নিঃসঙ্গতার ইন্দ্রিয়বিলাসে অবগাহন করেছি। নগরের ভিড়ে মানুষ যেমন একা

হ'তে পারে তেমন আর কোথাও নয়। পরিচয় নেই, নাম নেই, শুধু একটা অস্তিত্ব, চারদিকে খুলে-থাকা, ছড়িয়ে-পড়া, স্বেচ্ছাচারী চেতনা। এখানে কেউ কারো স্বামী নয়, বাবা নয়, চাকুরে নয়, অমুক তারিখের মধ্যে অমুক পত্রিকায় লেখা দিতে বাধ্য নয়—এই একটা জায়গা, যেখানে আমার আমিত্ব, সব রকম সামাজিক সংযোজন ঝেড়ে ফেলে, বিশুদ্ধ আর সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে। আর সেদিন—পকেট ভরা ছিলো, মন ভরা ছিলো, রাস্তাটাও যেন আবর্তের মতো বুদ্বুদ তুলছে : নিজেকে রাজার মতো মনে হয়েছিলো সেদিন।

রাজা না-ব'লে সেনাপতি বলা উচিত। চরম আক্রমণের প্ল্যান ক'রে ফেলেছি ততক্ষণে, শত্রুকে আজ রাত্রেই বিনাশ করা চাই, কাল থেকে প্রফুল্ল আর আমাকে দেখবে না, দেখতে চাইবে না, পারবে না—কাল থেকে আমার যন্ত্রণার অবসান হবে। খুঁটিনাটি কিছুই ভাবতে বাকি রাখিনি। কেমন ক'রে কাটাবো এই কয়েক ঘণ্টা, কত দূর পর্যন্ত মাতাল হবো, কেমন ক'রে আঙুলের গাঁটে প্রচণ্ড টোকা দেবো দরজায়। গিয়ে কী বলবো, কী করবো, শুধু এ-বিষয়ে মনস্থির করতে পারিনি ; অনেক রকম ক'রে ভেবেছি, অনেক রকম কথা সাজিয়েছি মনে-মনে, তার মধ্যে কোনো-একটাকে বেছে না-নিয়ে সবগুলোকেই সম্ভাবনার মধ্যে রেখেছি। সেনাপতি শিবিরে ব'সে যতই সাবধানে চিন্তা করুন, যুদ্ধক্ষেত্রের প্রেরণার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে বইকি। আমরা কি কখনো কোনো গল্প পুরোপুরি ভেবে নিতে পারি ? লেখার সময় অপ্রত্যাশিত লাফিয়ে ওঠে, লিখতে বসার আগে তা ভাবাও যায় না—শত্রুর মুখোমুখি না-হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের বিষয়ে ধারণাই অস্পষ্ট থেকে যায়।

ছুটো শস্তা বার্-এ ছুটো বিয়ার খেয়ে আস্তে-আস্তে এস্প্লানেডের

কাছে বোখারায় এলাম। নাম শুনে কেউ যেন না ভাবেন উঁচু জাতের ব্যাপার। ভারত-উদ্ধারকারী সৈনিক পুরুষের বিনোদনের জন্য চৌরঙ্গী ছেয়ে কত জায়গাই কেঁপে উঠছিলো তখন! এও তারই একটা; পর্দা-ঢাকা কেবিন আছে, কাংস্যবাদ্যের ব্যবস্থা আছে, নাচের জায়গা আছে মেঝেতে। বলতে গেলে খাকিধারীদের একচেটে, আমার মতো দু-একজন কড়া আদমি ছাড়া ধুতি-পরা বাঙালি কেউ আসে না। মাঝে অনেকদিন যাইনি, কিন্তু বেয়ারা দেখেই চিনতে পারলে, সেলাম ক'রে দূরের দিকে একটা ছোটো টেবিলে বসতে দিলে।

আটটা বেজে গেছে তখন, সিনেমার শো ভাঙতেই জায়গাটা জ'মে উঠলো। ইংরেজ, মার্কিন, নিগ্রো সেপাই—তাদের হল্লা আর পিয়ারিদের মধ্যে ব'সে দু-ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। গবাশ ক'রে খাচ্ছে তারা, চোঁ ক'রে গিলছে, বাঁ হাতে টাকা ফেলে দিয়ে হনহন ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও অন্য কোনো আমোদের খোঁজে। আমি ব'সে আছি এক কোণে; আস্তে-আস্তে, ভেবে-ভেবে অ্যালকহলটাকে নিজের মধ্যে কাজ করতে দিচ্ছি। খাঁটি স্কচ, দেরিতে ধরে, সেটাই চাই আমি। শস্তা রাম্‌ গিললে বেহুঁশ হ'লে চলবে না আজ; নিজের উপর নজর রাখা চাই, জরুরি কাজ আছে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণে অনেক দল এলো গেলো, কিন্তু সকলকেই এক লাগলো আমার চোখে, সকলেই যেন এক মুখস্থ-করা পার্ট ক'রে যাচ্ছে, কারো কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, বেছে নেবার কিছু নেই, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ব'লে কিছু নেই। সৈনিক ওরা, নম্বর-বসানো সৈনিক: এই ওদের ধর্ম। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আগামী মাসে ম'রে যাবে, কিন্তু কে মরলো আর কে বাঁচলো, তাতে যুদ্ধের কিছু এসে যায় না। তেমনি: রাম্‌ খেলেও যা জিন খেলেও তা-ই; এ-মেয়েটাকে বগল-দাবা করা যে-কথা, ও-মেয়েটাকে

শুড়শুড়ি দেয়াও তা-ই। কিন্তু আমার অবস্থা অন্য রকম। আমার যুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির।

ন-টার পরে বাদ্য বেজে উঠলো; ভুতুড়ে-মতো নীলচে আলোয় ভুতুড়ে-মতো পোশাক-পরা চার মূর্তি হাত-পা ছুঁড়লো খানিকক্ষণ; তারা যে মানুষ, এবং স্ত্রীলোক, তা বোঝা গেলো তখন, যখন চনাৎ ক'রে বাজনা থামলো, আর তারা একটু আড়ালে গিয়ে লম্বা নাকওলা মুখোশ আর পালক-গোঁজা টুপি ছেড়ে খদ্দেরের টেবিলেই বিশ্রামের জায়গা খুঁজলো। হঠাৎ দেখি, তাদের একজন আমাকেই পছন্দ করেছে।

—'Hullo, dearie !'

আমি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, তার রং-জ্বলা সাটিনের জামাটা যে অমন ভরপুর দেখাচ্ছে, তার কারণ কি তুলোর প্যাড, না কি ওটা সত্যি ?

মেয়েটা আমার পাশের চেয়ারে ব'সে প'ড়ে চুনো গলির ইংরেজিতে জানালে যে তার তেষ্টা পেয়েছে।

আমার নিজের গ্লাশ তখন তলানিতে ঠেকেছে। আর-একটা কি নিতে পারি ? হ্যাঁ, একটা, ঠিক আর-একটা। জীবনের সমস্ত ভার উবে যাবে, ঝাপসা হবে চারদিক, কিন্তু অন্ধকার নামবে না। ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছতে চাই। তার দেরি নেই, কিন্তু আরো-একটা চলতে পারে। রাতও আরো ভারি হবে তাতে, ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবো। এ-সময়টায় ওরা খেতে বসে, তারপর একটু বিশ্রাম, কি বইয়ের পাতা ওল্টানো—ঠিক যখন ওদের শোবার সময়, তখনই আমি ধাক্কা দেবো দরজায়। ঠিক আছে। চমৎকার। ইশারা ক'রে আরো দু-গ্লাশ দিতে বললাম। চাইবার আগেই সিগারেট দিলাম মেয়েটাকে।

গ্লাশ হাতে নিয়ে এলিয়ে ব'সে আমার হাঁটুর উপর একটা পা তুলে দিলে মেয়েটা। আমি বললাম, 'পা নামাও।'

কাছে স'রে এসে হাতের উল্টো পিঠটা বুলিয়ে গেলো আমার গালে। বললে, 'আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এটা বেআইনি। সোলজার হ'লে আলাদা কথা, কিন্তু অন্য কারো সঙ্গে দেখলে অ্যারেস্ট করতে পারে। You don't like me?'

আমি জবাব না-দিয়ে মেয়েটাকে শুধু দেখতে লাগলাম। এর পরে সে বললে, 'আমার এগারোটা অবধি ছুটি। ইচ্ছে করলে বেরোতে পারি।' আমার ঘাড় থেকে আস্তে-আস্তে পিঠের উপর দিয়ে হাত নামিয়ে আনলো।

আমি ব্যর্থ হ'য়ে চোখ সরিয়ে নিলাম। ব্যর্থ: কেননা, এতক্ষণ ধ'রে চেষ্টা ক'রেও নিজেকে এক কণা চেতিয়ে তুলতে পারলাম না আমি। আমি চেয়েছিলাম তা-ই, তা সম্ভব হ'লে সুখী হতাম, তাতে আমার আত্মসম্মান যেমন বেড়ে যেতো, তেমনি আরো তীব্র অপমান করা হ'তো প্রফুল্লকে। সে জানতো না—কিন্তু আমি তো জানতাম, কেমন উল্লাসে হাসতাম মনে-মনে। বীরেশ্বর গুপ্ত, যাকে ভালোবেসে নিজের স্ত্রীকেও হারাতে পারে প্রফুল্ল, সে যখন সগৌরবে তার দাবি জানাতে যাচ্ছে, তার আধ ঘণ্টা আগে সে পোকার মতো আটকে ছিলো একটা ময়লা, পচা, নারীমাংসের পিণ্ডের উপর। এত বড়ো তামাশা কি আর-কিছু!

কিন্তু পারলাম না। আমার রক্তমাংস জোচ্চোরি করলো আমার সঙ্গে; কিছুতেই, মুহূর্তের জন্যও, সাড়া দিলো না। আমি, যার কাছে এ-সব ব্যাপার এক গ্লাশ জল খাওয়ার মতো, আমি ফেল হ'য়ে গেলাম, এ-কথা লিখতেও লজ্জা করে, আজ পর্যন্ত ভাবতে ভালো লাগে না।

আজ পর্যন্ত, ঐ চুনো গলির মেয়েটার লোল ভঙ্গি আমার মনে পড়ে। আমার পালাবার একটা ছোটো দরজা খুলে দিয়েছিলো সে ; যে-বাঁধনে অর্চনা আমাকে আর নিজেকে জড়িয়েছে, তার বাধ্যতা থেকে পালাবার একটা সরু রাস্তা। তার সঙ্গে যদি যেতাম, হয়তো আমার প্রতিজ্ঞা টিকতো না, শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরেই যেতাম, কিংবা একেবারে নৃসিংহমূর্তিতে সারা রাতটাই কাটিয়ে দিতাম বাইরে। আর তারপর—তারপর থেকে হয়তো শক্তি পেতাম নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার—ঐ গলিবাসিনীরা সাহায্য করতো। অনেক মূঢ়তার পর এই চরম মূঢ়তা করতাম না তাহ'লে, আর শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকরও ঘটতো না।

—কিন্তু কী লাভ এখন এ-সব ভেবে। আমরা ভবিতব্যের শিকলে বাঁধা, আর তা আমাদের নিজেদেরই রচনা। সেই রাত্রে, সেই বোখারা রেস্তোরাঁয় ব'সে, আমার শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা উন্মাদ সুরে একটি কথা জপ করছিলো—শুধু একটি কথা : অর্চনা। ঐ মেয়েটাকে দেখতে-দেখতে, তার প্রস্তাবে রাজি হবার যখন চেষ্টা করছি, তখন আমি বুঝলাম যে এতক্ষণ ধ'রে ব'সে-ব'সে আসলে আমি শুধু অর্চনাকেই ভেবেছি, একটা অন্ধ জোয়ারের মতো আমার কামনা এগিয়ে গেছে তার দিকে, চরাচরে ছড়িয়ে গিয়ে বিন্দু-বিন্দু ক'রে চুঁইয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অন্য সব নারী তখনকার মতো ম'রে গিয়েছিলো আমার কাছে ; এই জন্তু-শরীরটাও জবাব দিলো না।

বিল্ চুকিয়ে দেবার সময় এক মুঠো নোট তুললাম পকেট থেকে। মেয়েটা তাকিয়ে রইলো। তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

বাইরে একটি আশ্চর্য কালো রাত্রি আমার নেশা-ধরা চোখের

সামনে সমুদ্রের মতো দুলে উঠলো। বেশ ঠাণ্ডা, উত্তর থেকে ধারালো হাওয়া দিচ্ছে মাঝে-মাঝে, কুয়াশার স্যাঁৎসেঁতে গামছাটাকে বুলিয়ে-বুলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মুখের উপর। ঠিক সেই ঋতু, যখন ঠাণ্ডা দেশে যক্ষ্মারোগীরা মরে, গরম দেশে বাতের কষ্ট বেড়ে ওঠে, আর সারা পৃথিবীতে চাপা-পড়া প্রাণের বীজাণুগুলো কিলবিল ক'রে বেরিয়ে আসে মাটির উপর। আমার ভিতরে নেশা, এই হাওয়াতেও নেশা; সৈনিকের ঝাপসা ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমি আস্তে হাঁটছি আর এদিক-ওদিক চোখ ফেলছি।

ট্র্যাম-বাস্ বন্ধ; ট্যাক্সি দুর্লভ। খালি একটা যেই দেখা দিচ্ছে, ভালো ক'রে থামার আগেই খাকি-কোর্তারা লাফিয়ে উঠে পড়ছে। তিন বার হেরে গেলাম তাদের কাছে, ট্যাক্সিওলা আমার দিকে দৃষ্টি-পাতও করলে না।—নির্বোধ। জানে না পৃথিবীর একমাত্র নারী অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্য।

এর পরের ট্যাক্সিটাকে আমি ছুটে গিয়ে ধ'রে ফেললাম, নিজেকে প্রায় ছুঁড়ে দিলাম ওর মধ্যে। অবজ্ঞার সুরে সর্দারজী জিগেস করলেন,—'কাঁহা যানা?'

'বালিগঞ্জ।'

'আট রুপেয়া পড়েগা।'

'দস্ মিলেগা। চলো!'

আর ট্যাক্সির হাওয়া উজানে বইলো আসন্ন থেকে উপস্থিতে: যে-কথা আমি বলবো, যে-কথা সে বলবে, সব আমি কানে শুনতে পেলাম। মনে হ'লো, যাওয়ামাত্র তাকে দেখবো, দেখামাত্র তাকে পাবো, তারপর এই রাত্রি আর ভোর হবে না।

কিন্তু দরজা খুলে দিলে প্রফুল্ল।

'এই যে, আসুন। আমরা আপনার কথাই—' বলতে-বলতে প্রফুল্ল থেমে গেলো। আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে ঘরে এলাম।

'প্রফুল্ল, আমি তোমার কাছে আসিনি। অর্চনাকে ডাকো।' সামনের সোফাটায় এলিয়ে প'ড়ে আবার বললাম, 'ডাকো অর্চনাকে। তার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

প্রফুল্ল আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। 'আপনি আজ অসুস্থ আছেন। বাড়ি যান।'

'আমি যাবো না। তুমি চ'লে যাও এখান থেকে প্রফুল্ল। তোমার চোখের তলে শিরা ফুলে উঠছে। লাল হ'য়ে উঠছে চোখ। তোমার দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তুমি যাও। তাকে পাঠিয়ে দাও।'

চোখে ঝাপসা দেখছি তখন, কথা জড়িয়ে আসেছে, তবু—যেমন কোনো-কোনো স্বপ্ন আমাদের বহুদিন পর্যন্ত স্পষ্ট মনে থাকে—তেমনি সেই রাত্রিরও সব কথা মনে পড়ে আমার। মনে পড়ে ব'লে মনে হয়, অন্তত। এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই প্রফুল্লর পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা চেহারাটা, তার নিঃশব্দ আর ঈষৎ উদ্বিগ্ন চলাফেরা, তার কপালের রেখা, তার ঈষৎ বড়ো-দেখানো চোখ।

'আপনি শুয়ে থাকুন—এখানে শুয়ে থাকুন একটু—' ফিশফিশ ক'রে সে বললে, 'একটু সুস্থ হ'লে বাড়ি যাবেন।'

আমি বললাম, 'প্রফুল্ল, তুমি কাপুরুষ। তোমার স্ত্রীকে কেন আসতে বলো না এখানে? আমাকে কেন ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দাও না? যদি তুমি পুরুষ হ'তে, তাহ'লে এ-দুটোর একটা কাজ নিশ্চয়ই করতে তুমি!'

'আপনি চুপ করুন। আর কথা বলবেন না। এই যে—আমাকে ধরুন। উঠুন তো। চলুন আপনাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।'

'না—' তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম আমি—'তোমার ও-সব ভালো ব্যবহার আমি চাই না। তোমার করুণার জন্য আমি আসিনি আজ রাত্রে, তোমাকে ধ্বংস করতে এসেছি।'

'উঠুন। একটু শান্ত হোন। আজ রাত্রে ভালো ক'রে ঘুমোন—কাল কথা হবে।'

'আমি যাবো না যতক্ষণ-না অর্চনাকে দেখতে পাই।' ব'লে আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখ ফেরাতেই অর্চনা আমার চোখে পড়লো। পাশাপাশি বসার ঘর আর শোবার ঘর, মাঝখানে দরজায় নীল রঙের পরদা ঝুলছে, সেই পরদা পিছনে রেখে শাদা শাড়ি প'রে দাঁড়িয়ে আছে অর্চনা। আমার যেন চোখ ধাঁধিঁয়ে গেলো, মনে হ'লো মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে যাবো। আমার গলা দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ বেরোলো, 'অর্চনা!'

প্রফুল্ল তাকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল, কিন্তু সে কয়েক পা এগিয়ে এলো আমার দিকে। লম্বা সোফাটায় আমি প্রায় শুয়ে পড়েছি, তখন, জুতো ফেলে দিয়েছি পা থেকে, একটা হাত অসহায়ভাবে ঝুলছে। শরীরটাকে আর নিজের ব'লে মনে হচ্ছে না। তবু বলতেই হবে, কথা আমাকে বলতেই হবে।

'প্রফুল্ল, তুমি এ-ঘর থেকে চ'লে যাও। যাবে না? তাহ'লে চোখ বুজে থাকো। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। তোমার এই লজ্জার দৃশ্য চোখে দেখো না, প্রফুল্ল। অর্চনা, তুমি কি বলবে তোমার স্বামীকে এ-ঘর থেকে চ'লে যেতে?'

ওরা দু-জন আমার দু-দিকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো, দু-জনেই আমার দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দ। আমি বলতে লাগলাম, 'অর্চনা, তুমি এত ভীরু? এত কপট? এখনো তোমার স্বামীর আশ্রয় চাও?

কেন তুমি তোমার মনের কথা খুলে বলো না? কেন দিনের পর দিন তোমার প্রতারণা—প্রফুল্লর সঙ্গেও, আমার সঙ্গেও?'

আমি দেখলাম অর্চনার মুখ পাথরের মতো, চোখ দুটো কঠিন কোনো মণির মতো জ্বলছে। মুহূর্তের জন্য প্রায় মনে হ'লো সে আমার কথার জবাব দেবে, কিন্তু সে আস্তে-আস্তে তার হাতের কাছের চেয়ারটায় ব'সে পড়লো—ভেঙে পড়লো—নিচু হ'য়ে মুখ ঢাকলো হাতের পাতায়। একটা অস্ফুট আওয়াজ আমার কানে বাজলো, ফাঁদে-পড়া জন্তুর কান্নার মতো। তারপর হঠাৎ একটা মস্ত নীরবতা ঘিরে ফেললো আমাকে।

সে-রাতেও সেই একটি দাঁড়ানো আলো জ্বলছিলো, কিন্তু তা-ই আমার মনে হচ্ছিলো বড়ো বেশি উজ্জ্বল। চোখের পাতা ভারি হ'য়ে নেমে আসছে, মনে হচ্ছে অন্ধকারের চেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর নেই মানুষের। প্রফুল্ল-যে ঘর থেকে চ'লে গেছে তা বুঝতে একটু দেরি হ'লো আমার। প্রফুল্ল নেই; অর্চনা ব'সে আছে—ঠিক তেমনি, নিচু হ'য়ে হাতে মুখ ঢেকে। আমি আমার দুই হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে, কিন্তু হাত দুটো অসাড় হ'য়ে ঝুলে রইলো। উঠে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমার শরীর প'ড়ে রইলো নিশ্চল। চীৎকার ক'রে ডাকলাম, কিন্তু নীরবতায় রেখাপাত হ'লো না। তবু আমার মৃত শরীর প্রতি রোমকূপে অনুভব করলে তার উপস্থিতি, আমার আহত চেতনার পরতে-পরতে সেই উপলব্ধি প্রবেশ করলো। মুহূর্তের জন্য এই পাপচিন্তাও ঝিলিক দিলো আমার মনে—'তার সঙ্গে একা আমি আছি, কী হয়েছিলো আমাদের মধ্যে, বা কী হয়নি, প্রফুল্ল কোনোদিন জানবে না, হয়তো জিগেসও করবে না কোনোদিন, কিংবা সত্য জবাব পেলেও বিশ্বাস করবে না—এই কাঁটা সারা জীবন বিঁধে থাকবে ওকে।

এইখানেই আমার জিৎ!' কিন্তু আমি কী করছি—অর্চনা কোথায় —আর এই অন্ধকারে লাল, নীল, সবুজ রং, আর কানের মধ্যে বাঁশির মতো আওয়াজ—আমি কি জেগে আছি—আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি—অর্চনা!

যখন জেগে উঠলাম, তখনো অন্ধকার। কোথায় আছি তা ধারণা করতেই অনেকক্ষণ কেটে গেলো। ধীরে ভেসে উঠলো ঘরের দেয়াল, দেয়ালের কোণে রেডিওগ্রামের আকৃতি, আলমারির মাথায় অদ্ভুত পুতুলের সারি। আমি কান পাতলাম, চারদিক মৃত্যুর মতো স্তব্ধ; পাশের ঘর থেকে নিশ্বাসপাতের শব্দ নেই। সেই সোফাটাতেই শুয়ে আছি দেখলাম; মাথাটা যেন থান-ইট, জিভ চামড়ার মতো শুকনো। হাৎড়ে-হাৎড়ে জুতো খুঁজে পেলাম না; আস্তে উঠে, আলো না-জ্বেলে, খোলা পায়েই বাইরে এলাম। ফ্ল্যাটের দরজা খোলার টুক ক'রে শব্দ হ'লো। একটু দাঁড়ালাম, কোথাও সাড়াশব্দ নেই। দরজা ভেজিয়ে, অন্ধকারে হোঁচট খেতে-খেতে নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। হাওয়ায় শীত; ভোর হ'তে দেরি নেই। খানিক হেঁটে, তারপর রিকশ নিয়ে বাড়ি এলাম। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর আলো জ্বললো।

সুধাকে পাশ কাটিয়ে দরজা থেকেই সোজা বিছানার দিকে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সুধা স'রে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। টেবিলের উপর টাইমপীসটাতে একবার চোখ ফেললো, একবার আমার দিকে তাকালো। ঘুম-ভাঙা গোল-গোল সরল চোখে তাকালো আমার দিকে—যেমন ক'রে শিশুরা চিড়িয়াখানার জানোয়ার ছাখে। খালি গায়ে শোয়া তার অভ্যেস; মস্ত, ভারি বুকের উপর খাটো আঁচল এলিয়ে, ঘুমে ভারি শরীর নিয়ে আমার দিকে তাকালো সে।

'সাড়ে-চারটে।'

'দেখছি তো।'

'এত রাত হ'লো?'

'হ'য়ে গেলো।'

'তোমার পায়ে জুতো দেখছি না?'

'স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেলো—ফেলে দিলাম।'

'ফেলে দিলে? সত্যি?'

'না, মিথ্যে। এখন ঘুমোতে দাও।'

'শোনো—' সুধা আবার পথ আটকালো। 'কোথায় গিয়েছিলে? ছিলে কোথায়?'

আমি জবাব দিলাম না।

'মদ খেয়ে চুর হয়েছো তা তো বুঝতে পারছি—কিন্তু ছিলে কোথায়?'

'জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, জানতে চাই। বলো, বলো কোথায় ছিলে তুমি।' আমাকে কাঁধে ধ'রে ঝাঁকুনি দিলে সে—'বলো! তোমাকে বলতেই হবে।'

হঠাৎ আমার একটু কষ্ট হ'লো সুধার জন্য। বেচারা। কী জীবন তার! আর-কোনো উপায় নেই ব'লেই তো প'ড়ে আছে এখানে।

'বলছো না?' সুধা একটু দূরে স'রে দাঁড়ালো। 'তাহ'লে আমিই বলছি। অর্চনার বাড়িতে ছিলে। ঠিক না?'

'ঠিক।' এখন থামো। শুতে দাও।' ব'লে আমি আর-একবার পা বাড়ালাম, কিন্তু সে ছুটে এসে একটা ভালুকের মতো লাফিয়ে পড়লো আমার উপর; আমাকে খামচে, খাবলে, গায়ের জামা ছিঁড়ে দিয়ে বলতে লাগলো, 'অর্চনা! অর্চনা রায়! ঘুমের মধ্যেও তার নাম

বলো তুমি! ছী-ছি-ছি! কী ঘেন্না! আবার নাকি বিয়েও হয়েছে! বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে প'ড়ে থাকো তা বুঝি—ঐ কাজ ওদের—পুরুষেরও ঐ কাজ—কিন্তু একজন ঘরের বৌ! যার বিয়ে হয়েছে! যার স্বামী আছে! ছেলেপুলে আছে! মদ খেয়ে, জুতো হারিয়ে—ঘেন্না! ঘেন্না! ঘেন্না!' বলতে-বলতে তার ঠোঁটে ফেনা উঠলো, আঁচল খ'সে পড়লো গা থেকে, বুকের দুটো মোটা মাংসপিণ্ড লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠলো তার হাত নাড়ার তালে-তালে। একটু দম নিয়ে আবার বললে—'আর ঐ লোকটা—ঐ প্রফুল্ল রায়—'

—'চুপ!'

'—ওটা কি একটা পাঁঠা, না কি তার বৌকে ভাড়া খাটায়?'

'চুপ করো!' আমার গলা ছিঁড়ে আওয়াজ বেরোলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে এক ধাক্কায় সুধাকে ফেলে দিলাম মেঝের উপর। ছেলেমেয়েগুলো ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলো।

এই প্রথম প্রতিবাদ সুধার। এই শেষ। বেচারা সুধা।

বারো

আবার নিঃসঙ্গতা—আবার শূন্যতার মরুভূমি। না—'আবার' বলাটা ঠিক হ'লো না; কেননা এতদিন আমি শুধু নিঃসঙ্গ ছিলাম, তৃষিত ছিলাম না। কিংবা, তৃষ্ণা যদি বা ছিলো, সে-বিষয়ে চেতনা ছিলো না আমার। নিঃসঙ্গতাকেই আমার স্বাভাবিক অবস্থা ব'লে আমি ধ'রে নিয়েছিলাম, মেনে নিয়েছিলাম অনিবার্য ব'লে। মাছ যেমন জলে, তেমনি ঐ অবস্থাটার মধ্যেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছি। সেটা কষ্টের কিছু নয়, আপত্তি করবার কিছু নেই তাতে; বরং আমার স্বভাবের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে অনুকূল। নিঃসঙ্গতা, স্বাধীনতা, দায়িত্বহীনতা: এ-ই সবচেয়ে কাম্য ছিলো আমার; আমি ঘৃণা করেছি সাংসারিকতাকে, বোকার মতো তার ফাঁদে একবার মাথা পেতে, তারপর ভণ্ডের মতো সেটারই জয়ধ্বনি করিনি, অবিলম্বেই গারদ ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। সেই বাইরেটাকে নোংরা ব'লে থাকে লোকেরা, কিন্তু আমি দেখেছি সেটা অন্তত ভণ্ডামি আর চালিয়াতি থেকে মুক্ত; সেখানে, যে যা নয় তা-ই ব'লে চালাতে চায় না নিজেকে—যা ভদ্রলোকেরা অনবরত ক'রে থাকেন; টাকার জন্য দেশের কাজ, নিজেদের বোতল ভরতি রেখে প্রহিবিশনের বক্তৃতা করা, সমাজে 'জলচল' হবার জন্য সাহিত্যের বুলি আওড়ানো, নিজের কামে ব্যর্থ হ'য়ে প্রতিশোধের জন্য 'পতিতা ভগিনী'দের উদ্ধার করা—অন্তত এ-সব পাপ নেই সেখানে; নেশাটা সেখানে নেশাই, আর জুয়োটা জুয়ো, আর বেশ্যারা খোলাখুলিভাবে শরীর বেচে—এগুলোকেই অন্য কোনো মিনিমুখো শৌখিন নামে সাজিয়ে

তোলার চেষ্টা নেই—এক হিশেবে অনেক বেশি পরিষ্কার জগৎ, আমার স্ত্রীপুত্রের বিড়ম্বনা-ভরা সংসারের চাইতে ভিতর-দিক থেকে অনেক বেশি খাঁটি আর পরিষ্কার। আর এই জগৎ নিয়ে—যেহেতু আর-কিছু আমার জানা নেই, আর যেহেতু আমি নিজের জীবনকে কোনোদিনই মূল্যবান ব'লে জানিনি—এই সব দাগি, কড়া, চকচকে, ছটফটে উপাদান নিয়ে একরকম নির্বিকারভাবেই বছরগুলো কাটিয়ে এসেছি আমি। সুখ ছিলো কিনা জানি না; কিন্তু মনস্তাপ ছিলো না, অভাববোধ ছিলো না, নকল-সাধু, নকল-পীর নকল-পণ্ডিতকে সেলাম জানাবার আত্মগ্লানি ছিলো না। ভালো ছিলাম।

কিন্তু এখন—এখন সব অন্য রকম। শুধু নিঃসঙ্গতা নয়, শূন্যতা—একটা অন্তহীন 'নেই' গহ্বরের মতো গ্রাস করেছে আমাকে। কী নেই? আলো নেই, গতি নেই, উদ্যম নেই, বেদনা নেই, জীবন নেই। একমাত্র যাতে এসে যায়, তা-ই নেই। অবশেষে কিছু-একটা পেয়েছিলাম, যাতে এসে যায়। যাকে, নিজে না-বুঝেও, মূল্য দিয়েছিলাম আমি। অন্য কোনো জীবন, কোনো—ব'লেই ফেলি কথাটা—কোনো সুন্দর জীবন। ভদ্র নয়, শোভন নয়, সামাজিক নয়, স্বাভাবিক এবং সুন্দর। স্বাভাবিক, অথচ সুন্দর। যে-জীবন আমার নয়, কিন্তু হ'তে পারতো। যাকে আমি প্রায় নিজের ক'রে এনেছিলাম। কিন্তু আমাকেই ধ্বংস করতে হ'লো; ভেবে-চিন্তে, পরিশ্রম ক'রে নিজের হাতে ধ্বংস করতে হ'লো। ধ্বংস করেছি, অথচ সেটাকে ভুলতে পারছি না। নেকড়ের পালের মতো, তৃষ্ণা আমার পিছনে ছুটছে। কোনো মদ নেই, সে-তৃষ্ণা যা মেটাতে পারে।

আমি রাত্রে ঘুমোচ্ছি, ঘুম থেকে উঠছি, আপিশে যাচ্ছি, বাড়িও ফিরছি এক সময়ে, কিন্তু আমার শরীরটা আমাকে বাদ দিয়ে কাজগুলো

ক'রে যাচ্ছে কোনোরকমে। স্নানের সময় নিজের একটা হাতের দিকে তাকিয়ে ভাবি : 'এই হাত আমার ? সত্যি কি আমি এই শরীরটার মধ্যে আছি ?' খাবার সময়ে মনে হয় : 'খিদে যার পায় সে তো এই শরীর ; আমি এর মধ্যে কোথায় ?' শরীরের সঙ্গে এই বিচ্ছেদবোধের ফলে অন্য কোনো উপায়েও ভুলিয়ে রাখতে পারি না নিজেকে। আমার এতদিনকার সহায়গুলো অকেজো হ'য়ে উঠলো। আমার শেষ সম্বল— যার জন্য পকেটে কয়েকটা টাকা মাত্র প্রয়োজন হয়—তাও পাছে হারাতে হয় ভেবে আতঙ্কে হিম হ'য়ে গেলাম। জোর ক'রে নিয়ে যাই নিজেকে ও-সব পাড়ায় ; কিন্তু তাদেরও তেমন খাঁটি ব'লে মনে হয় না আর, বিকট সন্দেহ দেখা দেয় যে ওরাও বদলিমাত্র, বই লেখার মতোই বদলি, আসল নয়, বাঁচা একে বলে না, আসলে আমি অন্য কিছু চাই।

এই সময়েই ইচ্ছার অসহযোগ কাটিয়ে নিজের উপর বলাৎকার করতে শিখলাম আমি। এটাই আমার বিষয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কথা। এতদিন যা উন্মাদনার জন্য করেছি, এখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাতে আমার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। নিষ্ঠুরভাবে ঠাণ্ডা। তেতো পাঁচনের মতো ব্যবহার করতে যাই ওটাকে, কোনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মতো ; কিন্তু ওষুধে কাজ হয় না। নিজেকে ভুলতে পারি না মুহূর্তের জন্য।

কিন্তু নিজের কথা বেশি ভাবতেও পারি না, ওদের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে প্রফুল্লকে, অর্চনাকে। কিন্তু 'মনে পড়ে' কথাটা কি ঠিক হ'লো ? আর-একটা প্রশ্ন : কাকে ? প্রফুল্ল—না অর্চনা : কার কথা ভাবি আমি ? দু-জনকেই ভাবি : একজনকে আলাদা ক'রে নেয়া অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। নিজের আমি কী-ক্ষতি করেছি ভাবি না কখনো : ওদের জীবনটাকে কী-রকমভাবে ভেঙে

দিলাম, কতখানি ভেঙে দিলাম—এই চিন্তা ঘুমের মধ্যেও আমাকে নিষ্কৃতি দেয় না। একটা পাথর বেঁধে নিয়েছি গলায়, সিনবাদ চেপে বসেছে কাঁধে : অনুক্ষণ, সারাক্ষণ, প্রতিক্ষণ তার বোঝা টেনে-টেনে চলেছি ; একটা বোবা, ভারি, বিক্ষত জন্তু অফুরন্তভাবে মারা যাচ্ছে অথচ যেন কখনোই পুরোপুরি ম'রে যাচ্ছে না। আমি তো গুণ্ডামি ক'রে চ'লে এলাম, পালিয়ে এসে বাঁচলাম—কিন্তু ওরা কেমন আছে ? আমার তো জীবন ব'লে কিছু নেই—কোনোকালেই ছিলো না—বানের জলে কুটোর মতো ভেসেছি—কিন্তু ওদের ছিলো সুগঠিত নৌকো, স্থির লক্ষ্য, অনুকূল স্রোত। কেমন ক'রে ওরা তাকিয়েছে পরস্পরের দিকে—সেই রাত্রে, পরের দিন, আরো পরে ? কেমন ক'রে কথা বলেছে, কী-কথা বলেছে ? ওরা কি এড়িয়ে গেছে পরস্পরের চোখ, ফাঁকা গলায় বাজে কথা বলেছে—আমার নাম আর মুখে না-এনে আমাকে আরো বেশি ঘাতকরূপে উপস্থিত রেখেছে নিজেদের মধ্যে ? না কি সোজাসুজি আক্রমণ ক'রে আমাকে নষ্ট করতে পেরেছে এতদিনে—অনেক কথা ব'লে, অনেক কথা শুনে, হয়তো কিছু কেঁদে এবং কাঁদিয়ে ? না কি এটাকে ধুলোর মতো ঝেড়ে দিতে পেরেছে গা থেকে ; তারা, চোদ্দ বছরের বিবাহিত, সন্তানের মা-বাবা—এতে সত্যি বলতে কী বা এসে যায় তাদের, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো পাগল যদি ঢিল ছোঁড়ে তাতে বড়ো জোর যে-শার্শিটা ভাঙবে সেটা সারিয়ে নিতে কতক্ষণ ! এমন কি সম্ভব হয় না যে তারা এতদিনে এটাকে ভুলে গিয়ে তাদের পুরোনো, তাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে ?

—যদি তা সম্ভব ব'লে একবারও ভাবতে পারতাম তবে তো আর ভাবনাই ছিলো না। কিন্তু আমি জানতাম সেটা হবার নয়। ফিরে পাবে কারা ? আর কে-ই বা কাকে ফিরে পাবে ? সেই পুরোনো

অর্চনা আর প্রফুল্ল তো আর নেই। দু-জনেই বদলে গেছে এর মধ্যে। শুধু অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে, কিন্তু প্রাণপদার্থ প্রথমে ম'রে যায়—তবে যদি আবার বেঁচে উঠতে পারে।

আমি জানতাম ওদের আঘাত কত গভীর। সবচেয়ে বেশি ওরা যা করতে পারে তা একটা অভিনয় মাত্র। যেন কিছুই হয়নি, এই ভান। কিন্তু ওটা থাকবে সব সময়, ছায়ার মতো, অদৃশ্য উপস্থিতির মতো ;—একবার যে এ-রকম হ'তে পারলো তাতেই তো ওরা বুঝেছে ওদের ভিৎ কত ভঙ্গুর। তার চেয়ে বড়ো লজ্জা আর কী হ'তে পারে ওদের—নিজেদের কাছে, আর পরস্পরের কাছে ?

দোষী কে ? অর্চনা ? না, দোষ আমার। কিন্তু অর্চনার কিছু দোষ না-থাকলে আমারই বা দোষ হয় কেমন ক'রে ? আবার মনে হয় : আসল অপরাধী প্রফুল্ল, সে কেন অঙ্কুরেই এটাকে বিনাশ করেনি, সব জেনেও কেন সে এখানে পৌঁছতে দিলো আমাকে ?

—কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জীবনের কথা কী জানি আমি, সুখী দম্পতীর কথা আমি কিছুই জানি না। যা করেছি, ভালোই করেছি ; আমার হাতে ওর বেশি ছিলো না—এর পরে সময়ের হাত।

—কিন্তু তবু, তবু আমি নিশ্চিত হ'তে পারি না যে ওরা আমাকে ঘৃণা করতে পেরেছে, ফেলে দিতে পেরেছে মন থেকে, নৌকোতে ভার-বাড়ানো বাজে মালের মতো। আর এখানেই নতুন ক'রে সব ভাবনার আরম্ভ হয়।

আমার মনে একটা পাগল ইচ্ছে জেগে উঠলো আর-একবার ওদের দেখে আসতে। শুধু একবার চোখে দেখবো—আর-কিছু না। প্রফুল্লর আপিশের সময় ওর বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি যদি ? কি ছুটির সময় আপিশের বাইরে ? ও-সব করবার কোনো বাধাই ছিলো না

আমার, কিন্তু মুশকিল এই যে দু-জনকে একসঙ্গে দেখতে চাই। একবার দূর থেকে দেখা যায় না কোনোরকমে? গরম পড়েছে: লেকে আসে না? সিনেমায় যায়? যদি একবার, মুহূর্তের জন্যও, ভাবতে পারতাম ওরা ভালো আছে!

এই রকম যখন ভাবছি—মাস দুই কেটে গেছে ততদিনে—কড়কড়ে শুকনো গরম কলকাতায়—একদিন সকালে আমার দরজায় মৃদু টোকা পড়লো। পাওনাদার ছাড়া কেউ বড়ো আসে না এই বাড়িতে—তেলওলা, বাড়িওলার হাফ-প্যাণ্ট-পরা ঢ্যাঙা ছেলেটা, আর তাদের সামনে (দৈবাৎ বাড়ি থাকলে) সুধাকেই যেতে দিই আমি, কেননা সে বেশ নরম ক'রে ফেরাতে পারে তাদের, আমি এক কথার পর দু-কথাতেই রেগে যাই। কিন্তু তারা সবাই কড়া নাড়ে—ঝনঝন ক'রে ঘোষণা করে তাদের দাবিতে ভরা আগমন, হঠাৎ ঐ মৃদু টোকাটা আমার কানে নতুন লাগলো ব'লে আমি নিজেই উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

বাইরে প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে।

ঘরে বসবার জায়গা নেই, আমি গেঞ্জি গায়েই তার সঙ্গে রাস্তায় এলাম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম দু-জনে, গলির মোড়ে এসে প্রফুল্ল থামলো। প্যাণ্টের পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের ক'রে বাড়িয়ে দিলে।

রাস্তায়, আকাশের তলায়, রোদ্দুরে, তাকে দেখে আমি তখনই বুঝলাম যে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। আমি যা করেছি, সেই ক্ষতির পরিমাণ তার মুখেই লেখা আছে। ক্লান্ত দেখলাম তাকে, যেন হঠাৎ বয়স বেড়ে গেছে। আগে কখনো বুঝিনি তার মাথার চুল এত ধূসর, নাকের পাশে রেখা এত গভীর। এতদিন তাকে ঘরের মধ্যে দেখেছি, প্রায় সব সময় রাতের ম্লান আলোয়, এখন রোদ্দুর তার

সব গোপন দুর্বলতা নিষ্ঠুরভাবে উদ্‌ঘাটন ক'রে দিলে। কিন্তু রোদ্দুরকে দোষ দিয়ে কী হবে।

বললাম, 'একটু স'রে আসুন। এদিকে ছায়া আছে।'

একটা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম দু-জনে। টুংটুং ক'রে একটা রিকশা চ'লে গেলো।

প্রফুল্ল বললে, 'আমি আবার এলাম আপনার কাছে। একটা কথা বলতে এলাম।'

'বলুন—' আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—'আমি কী করতে পারি, বলুন। আদেশ করুন আমাকে। আপনি বললে আমি এ-মুহূর্তে কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাবো। আমি সব পারি। তোমার জন্য আমি সব পারি, প্রফুল্ল।'

'আপনাকে আর-একবার আসতে হবে।'

'কোথায়?'

'আমি—আমরা যেখানে থাকি। আর-একবার। তারপর আর বলবো না।'

আমার মুখ কঠিন হ'য়ে গেলো, চোখ দুটো নিবদ্ধ হ'লো তার মুখের উপর। সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'কথাটা এই যে আপনার অভাব ভুলতে পারি না আমরা। মস্ত একটা ফাঁকা—অন্য কিছুতেই তা ভরানো যায় না। জানি, আপনার পক্ষে আরো অনেক কঠিন সেটা। কিন্তু, উপায় কী।'

'একমাত্র উপায়,' আমি ব'লে উঠলাম, 'আর কখনো দেখা না-হওয়া।'

'জানি। কিন্তু আমি তা চাইনি কখনো। এখনো চাই না।'

'এখনো চান না? যা-কিছু হ'য়ে গেলো তার পরেও না?'

'তার পরেও না। অর্চনা বলে, "আমার জন্মেই এ-সব হ'লো, আমি না-থাকলে সুন্দর বন্ধুতা হ'তো তোমাদের। সব নষ্ট হ'য়ে গেলো —আমারই জন্ম।" আমি তাকে বলি, "তুমি না-থাকলে বন্ধুতা হ'তো না। কিছুই হ'তো না।"'

'এ-সব কথায় কী লাভ এখন?' একটু অসহিষ্ণুভাবে আমি বললাম. 'আপনারা—ভালো থাকুন—যে ক'রে হোক চেষ্টা করুন তার জন্ম—আর-কিছুরই কোনো অর্থ হয় না।'

'আমিও ভেবেছি সে-কথা। কিন্তু মুশকিল এই, আমরা প্রত্যেকেই অন্ম দু-জনকেই চাই। সোজাসুজি বেছে নেবার কিছু নেই এখানে। কেউ কারো জায়গা নিতে পারে না। সে-ই তো মুশকিল।'

'কিন্তু আগে ছিলেন না আপনারা? এতদিন ধ'রে একসঙ্গে একই জীবন কাটাবার পর—'

'সেটা আর নেই।' আমার কথায় বাধা দিলো প্রফুল্ল, যেটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক।

'আছে! নিশ্চয়ই আছে! আমাকে বাদ দিয়ে দিন: এ-রকম একটা বাজে ব্যাপারটাকে এত মূল্য দেবেন কেন আপনারা? আমি খারাপ লোক; আমার মধ্যে ভালোবাসা নেই, শুধু জন্তুর চাহিদা আছে। যে-কোনো, যে-কোনো উপায়ে আমার বিরুদ্ধতা করুন—এই আমার প্রার্থনা আপনার কাছে।'

'নিজের বিরুদ্ধতা আপনি তো কম করলেন না। তাতে কি ফল হ'লো?'

'কিন্তু সময় আছে এখনো। আপনি ফিরে যান, যেখানে ছিলেন সেখানেই ফিরে যান; আস্তে-আস্তে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'তা-ই মনে হয় আপনার?' হঠাৎ যেন ঠাট্টা ঝিলিক দিলো প্রফুল্লর

ঠোঁটে। 'কিন্তু যেখানে ফিরে যেতে বলছেন সেই জায়গাটা কি আর সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে?'

'হয়তো সেটা অপেক্ষা ক'রে আছে সামনে। আমি স'রে গেলেই তার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমাকে তুমি আর ডেকো না, প্রফুল্ল!'

একটু চুপ ক'রে রইলো সে, হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতোর তলায় মাড়িয়ে দিয়ে।—'বেশ, তা-ই হবে। আর ডাকবো না আপনাকে। কিন্তু আজ একবার আসবেন। অর্চনা কাল দারজিলিং চ'লে যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে।'

'তুমি যাচ্ছো না?'

'এখন ছুটি পেলাম না। পারি তো পরে যাবো।'

'তাহ'লে সবাই মিলে পরে গেলেই হয়।'

'না। এই ব্যবস্থাই ভালো। আমাদের সকলেরই একা থাকার দরকার হয়েছে।' প্রফুল্ল তার হাত-ঘড়িতে চোখ ফেললো। 'তাহ'লে আসছেন আজ সন্ধেবেলা?'

'তুমি বলছো আসতে?'

প্রফুল্ল নরম ক'রে হাসলো। অন্য রকম গলায় বললে, 'আসবেন। ওখানেই খাবেন রাত্রে। এখন চলি—আপিশের বেলা হ'লো।'

'গাড়ি কোথায়?'

'আনিনি। বাস্ নেবো।'

তার-সঙ্গে বড়ো রাস্তা অবধি এলাম। মুহূর্তের জন্য হালকা হ'য়ে গেলো আমার মন, প্রায় সুখী মনে হ'লো নিজেকে। খুব ইচ্ছে করলো তার হাত দুটো একবার জড়িয়ে ধরতে; কিন্তু লজ্জায় পেছিয়ে গেলাম। লজ্জাটাকে উপভোগ করলাম মনে-মনে।

তেরো

নতুন আরম্ভের মতো মনে হ'লো, যখন তাদের ফ্ল্যাটে গেলাম সন্ধের পরে। বসবার ঘরের ব্যবস্থার একটু বদল হয়েছে, পিকাসোর বদলে একটা দিশি ছবি ; চ্যাপ্টা টেবিলে সারি-সারি কিছু নতুন বই চেৎ ক'রে সাজানো। প্রফুল্লর মুখ দেখে সকালে আমার যা-ই মনে হ'য়ে থাক, এই সব জড় বস্তুগুলি—দরজার পরদা থেকে প্রত্যেকটি চকচকে অ্যাশ-ট্রে পর্যন্ত—শৃঙ্খলাই শুধু প্রচার করছে। ভাঙচুরের তিলতম লক্ষণ নেই কোথাও, কিছু নেই মলিন বা উদাসীন, বরং সবই যেন নতুন কোনো উজ্জীবনের দিকে উন্মুখ ; আমি পর্যন্ত ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় প'রে, চুলে তেল-জল দিয়ে, নম্র আর সহাস্যভাবে ব'সে আছি। আশ্চর্য শান্ত একটা ভালো-লাগার আবহাওয়া সেদিন পেয়েছিলাম ; যেন ওরা আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু যাদের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হ'লো ; অল্প একটু লজ্জা আছে পরস্পরের মধ্যে, কিন্তু কোনো আড়ষ্টতা নেই—পরস্পরকে গ্রহণ ক'রে নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি।

এই অদ্ভুত কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো আজ পর্যন্ত আমি তা জানি না। সুন্দর একটা হালকা-নীল শাড়ি পরেছে অর্চনা। আগের চেয়ে একটু বেশি উপস্থিত সে, একটু বেশি কথা বলছে; যদি তা ভিতরকার কোনো অপ্রতিভতা লুকোবার জন্য হয়, তার ব্যবহারে তা ধরা পড়েনি। সোজা তাকালো আমার দিকে (আমিও তার দিকে তাকাতে পারলাম) ; নানা রকম ছোটো-ছোটো কথা হ'লো ; ছেলেমেয়ে দুটিকে আসতে দেয়া হ'লো কিছুক্ষণের জন্য, ঘরের মধ্যে

একটা সুগন্ধি হাওয়া রেখে গেলো তারা। খাবার আগে প্রফুল্ল ইটালিয়ান ভার্মুথ বের করলে, খাবার সঙ্গে এলো হালকা ফরাশি শাদা ওয়াইন। এগুলো গ্রহণ করতে প্রথমে একটু সংকোচ হ'লো আমার; কিন্তু আমার লজ্জা কাটাবার জন্য ওরা যখন সৌজন্যের রাজা হ'য়ে উঠলো, তখন আমিই বা কাঙালের মতো মুখ ফিরিয়ে থাকবো কেন। ওদের সঙ্গে যোগ দিতেই হবে আমাকে—প্রফুল্লর কোনো কথা অমান্য করতে পারি এমন শক্তি আমার কোথায় আজ।

বোঝা গেলো, প্রফুল্ল অনেক যত্নে আজকের এই সন্ধ্যার ব্যবস্থা করেছে। শুধু খাওয়া নয়, রীতিমতো একটি অনুষ্ঠান। যুদ্ধের অনটনের মধ্যে বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করেছে এ-সব পানীয়; তার টেবিল প্রাচুর্যে উচ্ছল; সেখানে, তাদের দু-জনের মাঝখানে ব'সে, আমি ভুলে গেলাম পৃথিবীতে কোথাও কোনো দুঃখ আছে, বিকৃতি আছে। পৃথিবীতে নেই, এখানেও নেই; এখানে যারা উপস্থিত তাদের কোনো দুঃখ নেই আর। কী সুস্বাদু খাবার, কী শীতল আর মসৃণ মদ, কী সুন্দর অর্চনা, আর প্রফুল্ল কী দেবতার মতো মানুষ। খাওয়া যত অগ্রসর হ'লো, ততই আরো স্বচ্ছন্দে আমি কথা বললাম; একেবারে নতুন মানুষ মনে হ'লো নিজেকে; শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লরই জয় হ'লো এ-কথা ভাবতে আমার অস্তিত্বটাকে সার্থক মানলাম। সব ভুল ভেবেছিলাম—মনে-মনে বললাম আমি—প্রফুল্ল আজ সকালে সব ভুল বলেছিলো—কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে, পরস্পরকে হারিয়ে ফেলেনি, ওরা, আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে আমাকেও ওরা বাঁচিয়ে তুললো আবার। এর প্রতিদানে কী করতে পারি আমি, কী আমার দেবার আছে, আমার সকল সত্তা নিংড়ে বের ক'রে দিলেও এর কাছে তার মূল্য কতটুকু।

খাওয়া শেষ হ'লো, হাত-ধোবার বাটিও সরানো হ'য়ে গেলো ; প্রফুল্ল বললে, 'আসুন এটা ক'রে ফেলা যাক।'

'ও-ঘরে গিয়ে বসলে হয় না ?' অর্চনা ওঠার মতো ভঙ্গি করলে, কিন্তু প্রফুল্ল বাধা দিলে তাকে। 'বোসো। এখানেই বসা যাক। বেশ লাগছে। তুমি নেবে আর-একটু ?'

'না। আর ওটা না-ই বা শেষ করলে।'

'আর অল্পই আছে।' দুটো গ্লাশ ভরতি ক'রে দিলে প্রফুল্ল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই ওয়াইন ভালো লাগলো আপনার ?'

'খুব ভালো। সবই ভালো। জানি না আর কখনো আমার এত ভালো লেগেছে কিনা।'

'রাতটিও সুন্দর হয়েছে,' প্রফুল্ল জানলার বাইরে তাকালো। 'খুব জ্যোছনা আজ, জানেন ? আর কী-রকম হাওয়ার শব্দ বাইরে।'

আমি বললাম, 'তার জন্যে কিছু হয়নি ; আপনাদের জন্যই সব ভালো লাগছে আমার।'

'কিন্তু রাতটার দিকে তাকানো উচিত। দেখুন।' প্রফুল্ল উঠে আলো নিবিয়ে দিলে। হঠাৎ জ্যোছনার দুটো বড়ো-বড়ো ফালি জেগে উঠলো ঘরের মধ্যে। বাইরের গাছপালার কালো পুঞ্জ আমার চোখে পড়লো। তার উপরে আকাশের একটা নীল টুকরো। আর, একই সময়ে, অর্চনাকে আমি অনুভব করলাম, এত কাছে আমার। শুনলাম তার নিশ্বাসের শব্দ, অন্ধকারে ঝিলিক দিলো তার চোখ।

তারপর অর্চনা উঠে আলোটা আবার জ্বেলে দিলে। আমাকে বললে, 'চলুন ঘরে গিয়ে বসবেন।'

'যাবেন ?' জানলায় কনুই রেখে প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে, হাতে সরু-ডাঁটের গ্লাশ, তার পিছনে চাঁদের আলোর রাত্রিটাকে এখন ইলেট্রিক

আলোতেও বোঝা যাচ্ছে। আবার তাকে তরুণ দেখাচ্ছে, প্রায় কিশোরের মতো, ফিরে এসেছে তার মুখের লালচে আভা, তার গলার আওয়াজ মখমলের মতো মসৃণ। 'না, ঘরে গিয়ে কাজ নেই। চলুন, বেরোনো যাক। চলো, অর্চনা। গাড়িতে তেল ভরতি আছে আজ। চলো।'

'এখন আবার বেরোতে চাও তুমি?' অর্চনা এ-কথা বলামাত্র আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আজ থাক। মিসেস রায় কাল চ'লে যাচ্ছেন—গোছগাছ আছে—আজ একটু শিগগির শুয়ে পড়া ভালো।'

'কাল? কালকের অনেক দেরি আছে এখনো।'

'বেশ তো; তুমি ঘুরে এসে এঁকে নিয়ে। আমি থাকি।'

'সে কী হয়!' প্রফুল্ল হেসে উঠলো। 'তার কোনো মানেই হয় না।' গ্লাশের তলানিটুকু এক ঢোঁকে শেষ ক'রে সে একটু পাইচারি করলে ঘরের মধ্যে। 'এখন না-হ'লে আর হবে না কখনো। আবার কবে দেখা হবে এই তিনজনের।'

'হবে বইকি? নিশ্চয়ই হবে! আপনারা তো এখানেই রইলেন,' অর্চনা আমার দিকে তাকালো, 'আর আমিও ফিরে আসবো।' হাসতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু আমি দেখলাম তার মুখ ম্লান।

'তাহ'লে আর দেরি কিসের,' প্রফুল্ল এগিয়ে এলো অর্চনার কাছে। তার কাঁধে হাত রেখে আস্তে বললে, 'লক্ষ্মী তো, চলো!' তার স্পর্শ থেকে ঈষৎ পিছনে স'রে গেল অর্চনা। কিন্তু প্রফুল্লর উদ্দীপনাকেও সে ঠেকাতে পারলে না; কয়েক মিনিট পরে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

নিচে এসে প্রফুল্ল বললে, 'একটু দাঁড়াও তোমরা। গাড়িটা বের

করি।' সে অদৃশ্য হ'লো গারাজের দিকে; রাস্তার গাছগুলো নিশ্বাস ফেললো হাওয়ায়; আধো জ্যোছনায়, আধো ছায়ায় অন্য একটা জগৎ জেগে উঠলো। ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে অন্ধকার যেমন ঘন, জ্যোছনা, তেমনি উজ্জ্বল; কাকগুলো বোকার মতো চ্যাঁচামেচি করছে; এপ্রিল অথবা মে মাসের ছড়ানো মেঘের ঝোড়ো আকাশে একটা গোল, চ্যাপ্টা, দাগ-ধরা চাঁদ ছুটে-ছুটে কোনোখানেই থামতে পারছে না।

একটু অপেক্ষা করতে হ'লো আমাদের। বাড়ির পিছন দিকে গারাজ, সামনে খানিকটা জমি, গাড়ির জন্য রাস্তা করা আছে। সিঁড়ির ঠিক বাইরে আমরা দাঁড়িয়েছি, মাথার উপরে বাড়ানো একটু ছাদের জন্য ছায়া করেছে সেখানে। তার মধ্যে অর্চনার নীল শাড়িটা ঢেউ তুলে এগিয়ে এলো আমার দিকে।

আমি বললাম, 'দারজিলিঙে কি অনেকদিন থাকবেন?'

'যতদিন ছেলেমেয়ের স্কুল না খোলে। তারপর জানি না।'

'প্রফুল্ল যাবে না?'

'উনিও ছুটির চেষ্টা করছেন, কিন্তু—' আমি একটা খশখশানি শুনলাম, অর্চনা আমার আরো কাছে স'রে এলো। 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই আমি।'

'বলুন।'

'প্রফুল্ল আপনাকে ভালোবাসে।'

'তা আমি জানি।'

'আর আপনি?'

'সে-কথা কি মুখে বলা যায়।'

'তারও দরকার আছে। প্রফুল্লকে ভালোবাসেন না আপনি?'

'বাসি।'

'আর আমাকে ?'

আমি নিরুত্তর।

'থাক। বলতে হবে না। জানি আমি সব। জানি, আমাকে ভালোবাসেন। একটা কাজ করবেন আমার জন্য ?'

'প্রফুল্লকে আমি বলেছি তার জন্য সব করতে পারি। তা না-হ'লে আবার আসতাম না।'

'সব পারেন ? বেশ। তাহ'লে এই কথা দিন আমাকে যে প্রফুল্লকে আপনি কখনো ছেড়ে যাবেন না। আমি যখন এখানে থাকবো না তখনো ছেড়ে দেবেন না তাকে।'

'কিন্তু আপনি থাকবেন না কেন ? ছ-মাস পরেই তো ফিরে আসবেন।'

'আমি সে-কথা ভাবছিলাম না।'

'তবে ?'

'আমি ভাবছিলাম—আমি চাই—আমি থাকি বা না থাকি তাতে যেন আর এসে না যায়। আমি—চাই প্রফুল্ল ভালো থাক। তার জন্যেই সব। তার জন্যেই আপনাকেও চাই আমি।'

'আর সেইজন্যেই নিজেকে আপনি আড়ালে রাখতে চান !' আমার এতক্ষণের সব ভালো লাগা মুহূর্তে চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেলো। দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো সব পুরোনো ঈর্ষা, আমার হিংস্রতার বিষ, ডাইনির চুল্লির মতো কামনা। ব'লে উঠলাম, 'না, অর্চনা, না! তুমি না-থাকলে কিছুরই কোনো মানে হয় না আমার কাছে। তুমি—তুমি—তুমি আমার সব !' ব'লে আমি ছ-হাতের মধ্যে ঝাপটে ধরলাম তার নীল-শাড়ি-পরা শরীর, তার সুগন্ধি মুখটাকে ভেঙে ফেললাম আমার মুখের উপর। সে স'রে গেলো না—না, অর্চনা

সরিয়ে নিলো না নিজেকে, আমার বুকের উপর ধ্বকধ্বক ক'রে বাজতে লাগলো তার হৃৎপিণ্ড।

তারপর আমি দেখলাম মস্ত কালো গাড়িটা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। অর্চনা উঠলো, সম্মোহিতের মতো আমিও উঠে তার পাশে বসলাম।

প্রফুল্ল এক পলক তাকালো তার স্ত্রীর দিকে। 'তোমার শাড়িটা কুঁচকে গেছে। বদলে আসবে নাকি?'

'থাক। ওতে আর কী হবে।'

'তাই তো। ওতে আর কী হবে।' প্রফুল্ল নিচু হ'য়ে গাড়ির খোপে হাৎড়ালো, একটা বেঁটে চ্যাপ্টা বোতল হাতে তুলে বললো, 'বীরেশ্বরবাবু, একটা নতুন জিনিশ খাওয়াই আপনাকে। আসুন। বোতল থেকেই খেতে হবে কিন্তু।'

অর্চনা বললে, 'ওটা কি গাড়িতেই ছিলো?'

'তা-ই তো দেখছি।'

'ওটা ফেলে দাও। আর খেয়ো না।'

'ভাবছো নেশা হ'য়ে যাবে? জানো না আমার মাথা কত শক্ত?— নিন। সুন্দর হয়েছে রাত্রিটা—না?'

তার হাত থেকে বোতল নিতে হ'লো। খানিকটা ঝাঁঝালো আগুনে পুড়ে গেলো ভিতরটা। ও-রকম কিছুই আগে খাইনি কখনো।

'প্রফুল্ল, তুমি আর খেয়ো না!'

'এই—একটু।' প্রফুল্ল ঘাড় উঁচু করলো, বোতলটা শূন্যে উঠে গেলো তার হাতে। বাঁ হাতে ঠোঁট মুছে, ছিপি এঁটে ওটা সরিয়ে রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

অবিশ্বাস্য একটা রাত্রি। কলকাতার রাস্তা চাঁদের আলোয় গ'লে

গেছে, ধাবমান গাড়ির দু-পাশে ব'য়ে যাচ্ছে নদীর মতো। কখনো ঝকঝকে রুপোলি, কখনো মেঘের ছায়ায় ইস্পাত-রঙের। আকাশে ছাড়া-ছাড়া মেঘ, ঝোড়ো চাঁদ, আর হাওয়ায় গাছগুলোর এমন অবস্থা যেন শিকড় ছিঁড়ে উড়ে চ'লে যাবে। ল্যান্সডাউন রোড নিঃশব্দে প'ড়ে রইলো পিছনে, লেকের জল চিকচিক ক'রে মিলিয়ে গেলো।

অর্চনা বললে, 'এবার ফিরি চলো।'

'এখনই? তোমার ভালো লাগছে না? এমন একটা রাত্রি জীবনে ক-বার পাওয়া যায়! চলো ডায়মণ্ড হার্বর।'

'অত দূরে?'

'দূর কী? চল্লিশ মিনিটে ফিরে আসতে পারি।' টালিগঞ্জের দিকে বেগে ছুটলো গাড়ি; খানিক পরেই দেখলাম শহর আর নেই, দু-দিকে ধানখেত আর ঝোপঝাড় আর প্রকাণ্ড একটা ধনুকের মতো আকাশ। মস্ত একটা মুক্তির জোয়ার ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আমাকে। মাতাল ছিলাম, সুখী ছিলাম—আশ্চর্য সেই অনুভূতি।

অর্চনা আবার বললে, 'আর না। ফিরে চলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম পাচ্ছে? এখানেই ঘুমোও না। আমার কাঁধে মাথা রাখো।' অর্চনার মুখের উপর চকিতে একবার চোখ ফেললো প্রফুল্ল। গাড়ির এঞ্জিন বোঁ ক'রে উঠলো; ষাট মাইল, সত্তর মাইলে কাঁপতে লাগলো স্পীডোমিটারের কাঁটা, নৌকোর দাঁড়ের মতো ছপছপ শব্দে বাড়ি লাগলো হাওয়ায়। 'বীরেশ্বরবাবু, আপনার ভালো লাগছে না?'

'চমৎকার! একেবারে ঠিক সময়, ঠিক জায়গা। কিন্তু প্রফুল্ল, তুমি আর দেরি করছো কেন?'

'দেরি করছি'?'

'না, আর দেরি না!' আমি চীৎকার ক'রে বললাম, 'আমাকে ফেলে দাও গাড়ি থেকে। শোনো—এই আমি দরজা খুলছি—ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও আমাকে—আমি আর ব'সে থাকতে পারছি না এখানে, আর সহ্য করতে পারছি না।'

ব'লে আমি গাড়ির দরজায় হাত দিলাম। প্রফুল্ল বললে, 'ওঁর নেশা হয়েছে। ওঁকে ধ'রে রাখো, অর্চনা। শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে রাখো।'

'কী পাগলামি!' অর্চনার আর্ত স্বর বেজে উঠলো—'আস্তে! আস্তে চলো! ফিরে চলো! বাড়ি চলো!'

আমি বলতে লাগলাম—'আর না! আর আমি সহ্য করতে পারি না! প্রফুল্ল, গাড়ি থামাও—আমি রাস্তার উপর শুয়ে থাকি—আমার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাও। আমি যদি ভয় না করি, তুমি কি ভয় করবে?'

'ও-সব নাটকের কথা আপনার মুখে মানায় না।'

'নাটকের কথা? না, না—সত্যি, সত্যি, সত্যি! আর কী আমি করতে পারি—আর কেমন ক'রে আমি প্রমাণ করতে পারি—'

'চুপ করুন—আপনার পায়ে পড়ি আপনি চুপ করুন।' অর্চনা আমার হাত চেপে ধরলে—আমি বুঝলাম সে থরথর ক'রে কাঁপছে।

'ঠিক! এই ঠিক! অর্চনা—তুমি থামিয়ে রাখো ওঁকে। এমন সুন্দর রাত্রিটাকে নষ্ট হ'তে দিয়ো না।'

'কিন্তু তুমি গাড়ি ঘোরাও। ফিরে চলো।'

'হ্যাঁ—সামনে একটা মোড় পেলেই ঘুরিয়ে নেবো। যা দেখছি, ফিরতেই হবে।'

গাড়ি মসৃণ বেগে ছুটতে লাগলো যেন অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়ে।

অর্চনার হাত ছাড়িয়ে সোজা হ'য়ে বসলাম, ব'লে উঠলাম—'প্রফুল্ল, শোনো আমার কথা—গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাই—আমাকে থেঁৎলে দিয়ে চ'লে যাও তুমি! তা যদি না পারো তাহ'লে তুমি অর্চনাকে আর পাবে না। প্রফুল্ল—'

আমি অর্চনার গায়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্রফুল্ল হাত ধ'রে জোরে ঝাঁকুনি দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে অর্চনাও ঝুঁকে পড়লো তার স্বামীর গায়ের উপর; গাড়ি বেঁকে গেলো। তারপর কী হ'লো মনে নেই—শুধু নারীকণ্ঠের চীৎকার দীর্ঘ হ'য়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।

সব শান্ত, নির্মল চাঁদ, উদার আকাশ—তার তলায় ধানখেতের মধ্যে শুয়ে আছি। মনে হ'লো একটু দূরে কী-একটা দেখা যাচ্ছে, কালো একটা পুঞ্জ, হয়তো কোনো মানুষ। বুকে ছেঁচড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, একটা অকথ্য যন্ত্রণার বোঝা টেনে-টেনে, আস্তে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। গাড়িটা উপুড় হ'য়ে তুবড়ে প'ড়ে আছে, তার তলা থেকে বেরিয়ে আছে অর্চনার নিটোল মুখ, আর তার পরিপূর্ণ পিষ্ট যৌবন কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত। পাশে, হাঁটু ভেঙে ব'সে, প্রফুল্ল উপুড় হ'য়ে পড়েছে সেই মুখের উপর, পাগলের মতো ডাকছে, 'অর্চনা! অর্চনা! অর্চনা!'

কোনো উত্তর নেই। পাথরের মতো স্থির হ'য়ে গেছে অর্চনার চোখ, মৃতের দৃষ্টির মতো স্থির ও চিরন্তন—সেই চোখ, যা আমি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না।

আমাকে দেখে প্রফুল্ল বিকট আওয়াজে ব'লে উঠলো, 'বীরেশ্বর, তুমি এই করলে!'

আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার আগেই আমার সারা আকাশ অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

পরে শুনেছি, একটা মিলিটারি লরি আমাদের দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়েছিলো। আমি দু-মাস হাসপাতালে ছিলাম। প্রফুল্ল সেই হাসপাতালেই ছিলো শুনেছি, কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাইনি ; পরে সে কোথায় গেলো তাও জানি না। আর অর্চনার কথা আর-কিছু বলবার নেই।

* * *

—কিন্তু কিছুই বলা হ'লো না।

